ভক্তের ভগবান্।

(ভক্তিমূলক উপন্যাস)

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রক্ষিত,

মজিলপুর—২৪ পরগণা।

আশ্বিন, ১৩১৪।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

কলিকাতা,

১৭০নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন, সিমলা ;

"কালিকা-যন্ত্রে"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের

অদ্ভুত আকর্ষণে

যাঁহার নিষ্কাম দান ও দয়ায়

আমি বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছিলাম ;—

যাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, শরণাগত রক্ষা, বিদ্যানুরাগ,

প্রজারঞ্জন—অতুলনীয় ;—

আমার সেই দুর্দ্দিনের সহায়, পিতৃতুল্য পূজনীয়,

বঙ্গের আদর্শ ভূস্বামী,

পরম মাতৃভক্ত, ঈশ্বরজানিত মহাত্মা,

লালগোলার সর্ব্বজনমান্য ধার্ম্মিক বদান্য অধীশ্বর, শ্রীল

শ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ

রায় বাহাদুর মহোদয়ের

মহামহিমান্বিত নামে

প্রাণের গভীর কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিসহকারে

"ভক্তের ভগবান"

উৎসর্গ করিলাম।

ভূমিকা।

যে মহাপুরুষের পদারবিন্দ ধ্যান করিয়া "কামিনী ও কাঞ্চন" লিখিয়াছিলাম, সেই পুরুষোত্তমই আজ ভক্তবৎসল ভগবান্‌রূপে আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন;—তাঁহারই লীলামৃত অবলম্বনে "ভক্তের ভগবান্" লিপিবদ্ধ করিলাম। অহেতুক কৃপাসিন্ধু কাঙ্গালের ঠাকুর তিনি;—মনে হয়, এ কাঙ্গালকে কৃপা করিবেন। সেই আশ্বাসে এই গুরুতর কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। অথবা, আমি কে? তিনি যেমন চালাইয়াছেন, আমি সেইরূপেই চালিত হইয়াছি। ভক্ত বলিলেন, "তাঁহার হুকুম।" আশ্বস্ত হইলাম। চোখে জল আসিল। সেই জলভরা চোখে এই আলেখ্য আঁকিলাম। ছবি উঠিয়াছে, কি মুছিয়া গিয়াছে, তিনিই জানেন। ভাবরূপী জনার্দ্দন তিনি;—তাঁহার চরণে ইহা পঁহুছিলেই জীবন সার্থক বোধ করিব।

এই গ্রন্থ ঠিক্ উপন্যাস নয়, উপকথা নয়, ইংরেজী রোমান্সও নয়,—খাঁটী ভগবৎ-প্রেম বা ভক্তি-তত্ত্ব। সে

তত্ত্বও আবার যে সে লোকের লেখা নয়,—স্বয়ং ভক্তাবতার ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব্ব কথামৃত অবলম্বনে বিবৃত। ভক্তের নিকট ঠাকুরের কথা—বেদবাক্য। সেই বেদবাক্যই আমার অবলম্বন। সুতরাং আমার কৃতিত্ব ইহাতে কিছুই নাই। যদি কিছু গুণপনা প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা সেই ভক্তবৎসলের কৃপা; আর যে সমস্ত দোষ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, তাহা আমারই কৃতকর্ম্মের ফল—সহৃদয় পাঠক আমায় ক্ষমা করিবেন।

মজিলপুর, ২৪ পরগণা। — শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীচরণাশ্রিত, সেবক **শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।**

"ভক্তের ভগবান্।"

প্রথম খণ্ড।

সাধনা ও সিদ্ধি।

ভক্তের ভগবান্।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"মা আমায় ভক্তি দাও। তোমার ভাল নাও, মন্দ নাও, আমায় ভক্তি দাও। তোমার সু নাও, কু নাও, আমায় ভক্তি দাও। তোমার পাপ নাও, পুণ্য নাও, আমায় ভক্তি দাও।"

অতি আর্ত্তের হৃদয় লইয়া, দীনহীন কাঙ্গালের কাঙ্গাল হইয়া, ভক্ত ভগবান্‌কে ডাকিতেছেন।

ডাকের মত সে ডাক্,—ডাকিতে ডাকিতে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইতেছে, অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে, সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। সে ডাকে পাষাণ গলে, জড়-দেহেও কম্পন হয়, প্রতি অণু-পরমাণু সচেতন হইয়া উঠে। তন্ময় হইয়া, বাহ্য-জগৎ ভুলিয়া, প্রাণের ব্যাকুলতায়, মায়ের ছেলে মাকে ডাকিতেছেন,—"মা আমায় ভক্তি দে। আমি মুক্তি চাহি না, আমায় ভক্তি দে। আমি স্বর্গ চাহি না, আমায় ভক্তি দে। আমি সালোক্য সাজুয্য নির্ব্বাণ মোক্ষ—এ সব কিছুই চাহি না,—আমায় ভক্তি দে।"

অতি পবিত্র মধুর কণ্ঠে, প্রাণ খুলিয়া, মনের সকল বাঁধন ছিঁড়িয়া, সরল শিশুর মত আব্দার করিয়া, ভক্ত মাকে ডাকিতেছেন। সম্মুখে বরা-ভয়দায়িনী, ত্রিলোকজননী, করালিনী কালী। মায়ের পাদপদ্মে বিল্বদল ও রক্তজবা, অধরে লুক্কায়িত হাসি, ত্রিনয়নে করুণা-দ্যুতি; ভক্তের হৃদয়-দর্পণেও মহামায়ার এই মহাভাবের প্রতিচ্ছবি। তাই ভক্ত একনিষ্ঠ হইয়া অন্তরের আকুলতায় ডাকিতেছেন, আর ডাকিতে ডাকিতে কাঁদিতেছেন,—

"কেন মা নিদয়া হবি ? দেখা দে। ভক্ত রাম-প্রসাদকে দেখা দেছিলি, আমায় কেন দিবিনি—দেখা দে। আমি কি তোর ছেলে নই ?—দেখা দে। দে—দে—দে মা ! নইলে আমি আত্মঘাতী হ'বো।"

এমনি দৃঢ়তার সহিত হুঙ্কার ছাড়িয়া প্রার্থনা করিতে করিতে, ভক্ত কাঁদিতে লাগিলেন। কান্না এই এক দিন নয়, একবার নয়, বহু দিন হইতে এমনি ভাবে, এই সরল শান্ত স্বর্গীয় ভাব-সাধনা চলিয়া আসিতেছে।

মায়ের মন্দির-দ্বার রুদ্ধ। ঘোরা তিমিরা রজনী। জনমানবের সাড়াশব্দ নাই। একটি মাত্র আলোক মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে।

সহসা সেই দীপালোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, এবং সেই উজ্জ্বলতার সঙ্গে সঙ্গে দীপ নির্ব্বাণ হইল।

মন্দির অন্ধকার, ভক্তের হৃদয়-মন্দির কিন্তু আলোকিত। সে আলোকে তাঁহার চক্ষু ফুটিল। বুঝিলেন, ভক্তবৎসলা ভবানী প্রসন্না হইয়াছেন। প্রাণ পুলকে পূরিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে

দেখিলেন, একটি দিব্য ব্রাহ্মণবালিকা-মূর্ত্তিতে—অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ ছড়াইয়া—মা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন !

সে অপরূপ রূপের জ্যোতিতে ভক্ত নিমগ্ন হইলেন। আপনাকে ভুলিলেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ হইল,—নির্ব্বিকল্প সমাধি আসিল।

ক্রমে সে ভাব অপসারিত হইল। আবার সহজ স্বাভাবিক ভাব আসিল। ভক্তের সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত, রোমাঞ্চিত ও কণ্টকিত হইয়া উঠিল। দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া—নিশ্চল, নির্নিমেষ ও স্থির রহিল। মুখে একটি মাত্র কথা নাই; আর কোন প্রার্থনা নাই।

ভক্ত-বৎসলা ভবানী ভক্তকে তদবস্থায় দেখিয়া, অমৃত-শীতল মধুরকণ্ঠে বলিলেন, "বৎস, এই দেখ আমি আসিয়াছি। যেরূপে তুমি আমায় ধ্যান করিয়াছিলে, সেই রূপেই আমি আসিয়াছি। তুমি যাহা চাহিয়াছিলে—পাইলে; ভক্তি তুমি লাভ করিলে।"

ভক্ত তখনো সেইরূপ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে একদৃষ্টে চাহিয়া। সুকুমার শিশুর কণ্ঠস্বরের মত,

এবার মুখে কেবল মাত্র অস্পট মা মা রব ধ্বনিত হইল।

ত্রিলোকজননী পুনরায় সেইরূপ অমিয়স্বরে কহিলেন, "কি বলিতেছিলে—নিঃসঙ্কোচে বলো। তুমি যাহা চাহিবে—পাইবে; এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কিছুই তোমার অপ্রাপ্য নয়।"

ভক্ত তথাপি নির্ব্বাক্; জানু অবনত, হস্ত বদ্ধাঞ্জলি;—চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিতে লাগিল।

বরাভয়দায়িনী, জগজ্জননী, কল্পতরু কালী—এবার ভক্তের মস্তকে আপন পদ্মহস্ত অর্পণ করিয়া, স্মিতমুখে ইঙ্গিতে জানাইলেন,—"কি চাও বলো।"

ভক্তের মুখে এবার ভাষা ফুটিল। সে ভাষা, তোমার আমার ভাষা নয়,—দেবতারও দুর্লভ যে ভাষা, সেই ভাষা ফুটিল। করুণার্দ্র কণ্ঠে, একরূপ অপরূপ স্বরে, তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"মা, মা, ভক্তি!"

"তথাস্তু। আর কিছু? আর কোন প্রার্থনা আছে? বৎস, মুক্তকণ্ঠে বলো, তুমি যে বর চাহিবে, আমি তাহাই দিব।"

এবার যেন অতিমাত্র চঞ্চল ও চমকিত হইয়া,

ভক্ত বলিয়া উঠিলেন,—“দোহাই মহামায়ে! আর মায়া-জাল বিস্তার ক'রো না, আমি—মাত্র তোমায় চাই; তোমার পদাশ্রিতা শুদ্ধাভক্তি চাই;—আর কিছুই নয় মা।”

“তবে তাহাই হোক্, এ ঘোর কলি-যুগে তবে তুমি এই ভক্তি-তত্ত্বেরই প্রচার করো। আমি তোমাতে আবিষ্ট রহিলাম,—তুমি ও আমি এক হইলাম।”

“তুমি আমি এক—এ কি জননি?”

“এক—ভক্ত, ভগবান্ ও ভাগবত—এক বৈ দুই হয় না।”

“লোকে ইহা বিশ্বাস করিবে কি মা?”

“ভাগ্যবান্ যে, সে-ই বিশ্বাস করিবে। দুর্ভাগার ভক্তি-তত্ত্বে অধিকার নাই।”

“তবে,—মা!”

“কি বলিতেছিলে বলো।”

“সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিবার সৌভাগ্য আমার হইবে কি?”

“হইবে—তোমার ঐ পরাভক্তির ভিতর দিয়াই হইবে।”

"জয় মা কালী !—জয় মা কল্যাণী !"—হুঙ্কার ছাড়িয়া, আনন্দবিভোর প্রাণে, ভক্ত গান ধরিলেন,—

"দে মা আমায় পাগল কোরে।
আর কাজ নাই কালী, জ্ঞান-বিচারে।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "অজ্ঞান—পাগলেই তোমায় পাগল বলিবে,—তুমি জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ—ভক্ত-প্রধান—যোগীর শিরোমণি হইবে। তবে নিরক্ষর—প্রচ্ছন্নভাবে—সাধারণ মানুষের মত—এবার তোমায় থাকিতে হইবে।—এ লীলার এই বিধান।"

"মা, মা, এ অকৃতী অধম সন্তানের প্রতি এত দয়া তোর !"—ঝর্ ঝর্ ধারে ভক্তের দুই গণ্ড বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল।

মা কহিলেন, "আমার কি দয়া বৎস,—নিজ-গুণেই তুমি এ অমৃতের অধিকারী হইয়াছ। জন্ম জন্ম কঠোর তপস্যা করিয়া তুমি যাহা চাহিয়া আসিতেছ, কালপূর্ণ হওয়ায়—এ জন্মে তাহা পাইলে,—তুমি ব্রহ্মাদির দুর্লভ ভক্তিধনে অধিকারী হইলে। পরাভক্তি, শুদ্ধাভক্তি, জীবের কল্যাণপথগামিনী ভক্তি—তোমার হৃদ্গত হইল,—তুমি ভাবে আবিষ্ট

হইবামাত্র আমায় দেখিবে ; যাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে। না চাহিলেও সর্ব্বশক্তির অধীশ্বর হইবে।”

“শক্তিময়ি, সনাতনি ! সে তোমারই পূর্ণশক্তির বিন্দুবিকাশ ; সাগরে বুদ্‌বুদ্ মাত্র। আদ্যাশক্তি— মহাশক্তি তুমি ;—তাই মা তুমি কল্পতরু !”

“তবে যাও বৎস ! সংসারে যে খেলা খেলিতে আসিয়াছ,—হাসিয়া খুসিয়া, নাচিয়া গাহিয়া—তাহা খেলিয়া যাও,—আমি অলক্ষ্যে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, তাহা দেখিয়া যাই। এ-ই তোমার যোগ, এ-ই তোমার সাধন-সমাধি। সহজে কেহ তোমায় না চিনিতে পারে, ইহাই আমার ইচ্ছা।”

“ইচ্ছাময়ি ! আমিও তাই চাই। তবে মা, তোমার নাম উচ্চারণেই, যেন আমার ‘আমিত্ব’ লোপ হয়।”

“তাহাই হইবে,—মা-নামই তোমার সিদ্ধ-মন্ত্র হইবে। কলির জীবকে তাহাই শিখাইয়া যাও। দুর্ব্বল, অশক্ত, অন্নগতপ্রাণ জীব—মা বলিয়া কাঁদি-লেই আমায় পাইবে। আমার হইয়া তুমিই তাদের গতি-মুক্তি করিয়া দিবে। মা-নামের এই সহজ সাধন, এই স্বাভাবিক আকর্ষণ হইতেও, যে অভাগা

বঞ্চিত হইবে,' তার গতি জন্মে জন্মেও হইবার নয়—তাকে আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া—কীটপতঙ্গ তির্য্যকাদি হইয়া—আসিতে হইবে,—নর-জন্ম তাহার ভাগ্যে আর সহজে মিলিবে না।"

"মা, এ জন্মে কি আমায় কোনরূপ ভেক্ ধরিতে হইবে?"

"না।—যারা ভিক্ষা চায়, পরের মুখের পানে তাকায়, তাহারাই সংসারে ভেক্ ধরে। তোমার ভিক্ষারও দরকার নেই, কোন কামনাও নেই,—তুমি ভেক্ ধরিতে যাইবে কেন? রাজার হালে তোমার দিন কাটিয়া যাইবে। কোন কিছুর জন্যে কারো কাছে তোমায় হাত পাতিতে হইবে না। লোকে সাধিয়া—তোমার ঘরে জিনিস তুলিয়া দিয়া আসিবে।—সে জন্যে তারা লালায়িত হইবে।"

ভক্তি-গদগদকণ্ঠে ভক্ত বল্লিলেন, "মা, বুঝ্‌লেম, সত্যই আমি ভাগ্যবান্।"

"এই জন্য যে, কারো কাছে তোমায় যাচিঞা করিতে হইবে না। তুমি এই সংসারী বেশেই থেকো। সংসারী লোকের মতই ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ

নিয়ে খেলা কোরো—তাতে তোমার মোহ আস্‌বে না।”

“যদি মা আসে ?”

“ক্ষণেকের জন্য—তাতে লীলার কোন ব্যাঘাত হবে না। সংসারী লোক তোমায় দেখে সব শিখ্‌বে,—তোমার কথামৃত পানে মানুষ হবে।”

“তবে লীলাময়ি! তুমি দেখো, তুমি রেখো,—তোমার পাদপদ্মই যেন আমার সার হয়।—একটা ভয়, সাপে না ছোব্‌লায়;—পাঁকে না পড়ে পড়ি।”

মা স্মিতমুখে বলিলেন, “কি ?”

“কামিনী-কাঞ্চনরূপ পাঁকের ভিতর আমায় থাক্‌তে হবে—তাই ভাব্‌চি।”

“তাতে তোমার ভয় নেই—পাঁকাল মাছের মত তুমি থাক্‌তে পার্‌বে,—পাঁকের ছিটে-ফোঁটাও তোমার গায়ে লাগ্‌বে না।—ভুলে গেলে কি বৎস ?—তুমি যে আমার জীবন্মুক্ত ভক্তাবতার! যত দিন যাবে, লোকে ততই তোমায় চিন্‌বে,—তোমার মুক্তাত্মার পারিজাত-সৌরভে সংসার আমোদিত হবে।”

"মা, মা, মা !"—ভক্তের চক্ষে অবিরল প্রেমাশ্রু, হৃদয়ে পুলক, কণ্ঠে গদগদ ভাষ।

একটু সাম্‌লাইয়া বলিলেন, "তবে জননি! তোমার ঐ অভয় পাদপদ্ম—ঐ বরাভয়দায়িনী আনন্দময়ী মূর্ত্তি—চিরজন্মের মত আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করো ;—ঐ অপরূপ রূপের ছবি আমার বুকের ভিতর বুক চিরিয়া আঁকিয়া দাও ;—তোমার কৃপায় যেন মা আমি সর্ব্বভূতেই তোমায় দেখিতে পাই।"

"তাহাই পাইবে ;—এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমার আয়ত্তে আসিবে।—তবে এখন আমি আসি ?"

"কোথায় আসিবে মা ? আর যাইবেই বা কোথায় ? আসিতে হয় ত, এই বুকে এস।—এই দেখ মা,—বড় সাধে, বড় যত্নে, আজন্ম তপস্যা করিয়া, এই বুকেই তোমার পদ্মাসন পাতিয়া রাখিয়াছি।

এবার মা নীরব, ভক্তও নীরব। অনিমেষ নয়নে উভয়ে উভয়কে দেখিতে লাগিলেন। সে অলৌকিক দিব্যদৃষ্টির বর্ণন, এ কুহকতুরিতপূর্ণ ক্ষীণ লেখনীতে সম্ভবে না।

ভক্তের সেই দিব্যদৃষ্টির সঙ্গে, হৃদয়ে মহাভাবের সঞ্চার হইল। সেই মহাভাবে বিভোর হইয়া, তিনি দুই হস্তে, জগদম্বার সেই যোগিজনদুর্ল্লভ জগদারাধ্য পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিলেন। অঙ্গ অমৃত-শীতলতায় ভরিয়া গেল।—জগন্মাতা অন্তর্হিত হইলেন।

অন্তর্হিত হইলেন?—না, ভক্তের অঙ্গে মিলাইলেন?

মুহূর্ত্তকাল আবেশমগ্ন থাকিয়া, ভক্ত সহজজ্ঞান-লাভে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া জ্যোতিঃ স্ফুরণ হইতে লাগিল। তিনি আপন মনে বলিলেন, "হায়! কি দেখিলাম,—কি শুনিলাম! একি সত্য, না স্বপ্ন? যদি স্বপ্নই হয়, তবে মা! যেন জন্ম জন্ম এই সোনার স্বপ্ন লইয়াই থাকি!"

মাতৃভক্ত মহাত্মা গান ধরিলেন। আপন হৃদয় মন মাতাইয়া, সেই পবিত্র মাতৃমন্দির কাঁপাইয়া, সাধকের সাধা-সুরে—সুমধুর উচ্চকণ্ঠে গান ধরিলেন,—

"ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ-সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজ্‌লে পাবিরে প্রেম-রত্নধন।

খোঁজ্ খোঁজ্ খোঁজ্ খুঁজ্‌লে পাবি হৃদয়-মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি, জ্বল্‌বে হৃদে অনুক্ষণ॥
ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাঙ্গায় ডিঙ্গে,
চালায় বল সে কোন্ জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্, ভাবো গুরুর শ্রীচরণ॥"

"এ গুরু কে?"

"সেই সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবান্।"

"ভগবান্ কোথায়?"

"ভক্তের হৃদয়ে।"

"আর কোথাও কি তিনি নাই?"

"হাঁ, আছেন সর্ব্বত্রই—সর্ব্বভূতে; তবে ভক্তের হৃদয়ে সদা স্ব-প্রকাশ। তাই তিনি—"ভক্তের ভগবান্।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সকলেই বলে, রামরূপ চাটুয্যে ক্ষেপিয়া গিয়াছে। কি এক 'কামিনী-কাঞ্চন' যত অনর্থের মূল বলে, আর 'মা তুমি দেখো' ব'লে পাগ-লের মত প্রলাপ করে। ঘর-সংসারে মন নেই, যজমান শিষ্যিদের কাজে আটা নেই, নেওয়া-থোয়ার দিকে আদৌ লেহাজ-ই নেই। মার কান্না-কাটীতে-বিয়ে কোল্লে, তা সে বউকে নিয়ে ঘরও কোল্লে না। আহা, সতীলক্ষ্মী সে বউ; ভগবতীর মত রূপ; অনাথার মত বাপের বাড়ী পোড়ে রইল। লোকটাকে বোঝালেও বুঝ্ মানে না,—'হুঁ হাঁ' এক, আধটা কথা কয় আর হাসে। মাথা খারাপ হোয়ে গেছে—মাথা খারাপ হোয়ে গেছে।

—এই রকম সব টীকা-টিপ্পনী ও মন্তব্য, চারিদিক হইতে রাতদিন রামরূপের কানে যায়।—তাহাতে তিনি হাসেন আর রঙ্গ দেখেন।

কিন্তু তাঁর বৃদ্ধা জননী এই সব কথায় বড় মনস্তাপ পান। কখন কখন বা কাঁদিয়াও ফেলেন। মার চোখে জল দেখ্‌লে, রামরূপের আর ক্ষেপামি বা মত্ততা থাকে না,—তিনিও তাঁর সঙ্গে কাঁদিয়া ফেলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বুঝাইয়া বলেন, "কেন মা তুমি চোখের জল ফেল? পরে পরের ভাল দেখ্‌তে পারে না, তাই পাঁচজনে এসে তোমার কাছে লাগায় ভাঙ্গায়। অভাগীর দশা—আমার মাথা খারাপ হোতে যাবে কেন? আমি জগদম্বার নাম নিয়ে হেসে খেলে নেচে গেয়ে বেড়াই, তাদের তা ভাল লাগে না,—বলে আমি ক্ষেপে গেছি।"

মাতা উত্তরে বলিতেন, "তা মরুকগে লোকের কথায়—ঘরের বউকে বাছা তুমি নিয়ে ঘর কোচ্চ না কেন?"

"সময় হোলেই মা কোর্‌বো,—তোমার সাধ অপূর্ণ রাখ্‌বো না।—দিনটা কত মা তুমি দেরি করো,—তোমার পায়ে পড়ি।"

কিন্তু মাতা-পুত্রের, সেই পুণ্যময় শান্তি-কুটীর, পাড়ার অনাহূত-সমিতির উপদ্রবে স্থির থাকিবার যো রহিল না। অযাচিত আত্মীয়তার জ্বালায়, বৃদ্ধা জননী, পুত্রের কল্পিত দুঃখে, প্রকৃতই মর্ম্মাহত হইতে লাগিলেন। পুত্র রামরূপ, জননীর কষ্ট বুঝিলেন। বুঝিলেন, ত্রিলোক-জননী শঙ্করীর– তাঁহার ধর্ম্ম-পরীক্ষা করিতে সাধ হইয়াছে। তাই জগন্মাতা তাঁহার মাতার কাতরতা ও প্রতিবেশীর আত্মীয়তায় অবিচ্ছিন্নরূপে মিশিয়া, তাঁহার সম্মুখে বিরাজিতা। মনে মনে বলিলেন, "সময় হইয়াছে কি ?" মনই উত্তর দিল – "দেখ না একবার পরখ কোরে।"

এইরূপে আরও কিছুদিন গেল। নির্দ্দিষ্ট দিন আসিল। এ দিন এক প্রাচীনা আসিয়া, রামরূপের মাতৃদেবীকে, খুব ঘোরালো করিয়া শুনাইয়া গেলেন যে, যদি তাঁর বেটা-বউকে নিয়ে ঘর-সংসার কোত্তে সাধ থাকে, তো যেমন কোরে হোক, বউকে ঘরে আনুন,—নইলে তাঁর সোনার রাম বিবাগী হলো বোলে।—এমন কি, গেরুয়া ও চিম্‌টের খবর অবধি, ওপাড়া হইতে তিনি শুনিয়া আসিয়াছেন !

এ কথায়, পুত্রবৎসলা জননীর মনের অবস্থা

কিরূপ হইল, তাহা সকলেই বুঝিতেছেন। বৃদ্ধা মস্তকে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "হায় রে পোড়া-কপাল! পেটের ছেলেও এমন জ্বালা দিলে! বোন্, এ দুঃখ আর কারে বোল্‌বো?—আজ যদি তিনি থাক্‌তেন!"

দূর হইতে রামরূপ এই দৃশ্য দেখিলেন, ও মায়ের এই মর্ম্মান্তিক কাতর-কাহিনী শুনিলেন। মনে মনে বলিলেন, "মা শৈলসুতে! এ কি তোর মায়ার খেলা মা! সত্যই আমায় পাঁকে পুত্‌বি মনে কোরেছিস? না, তা পার্‌বি নে। মার কথাই পালন কোরবো—বউকে এনে ঘর কোর্‌বো। দেখ্‌বো বেটী, তোর কত বল? হায়, মা কাঁদচেন ও বিলাপ কোচ্চেন—ওঁর ঐ অশ্রু ও বিলাপেও তুই! হাঁ, ঐ যে, আমি স্পষ্ট দেখ্‌চি, তুই মার মনের কল-কাটী নাড়্‌চিস।—তা দেখি, কে হারে আর কে জেতে?"

প্রকাশ্যে আসিয়া, মায়ের চরণে প্রণত হইয়া, মাতৃভক্ত পুত্র গদগদ কণ্ঠে কহিলেন, "মা, আর কেঁদো না, কেঁদো না। তোমার ঐ একবিন্দু অশ্রু-জলে আমার পতন হবে—সব যাবে। মহাদেবী—

প্রত্যক্ষ পরমেশ্বরী তুমি মা আমার! তোমার কৃপায় ব্রহ্মময়ী মাকে আমি চিনেছি—হায়! কেন মা তুমি সন্তানের অকল্যাণ করো? দোহাই মা, আর না! তোমার ঐ একটি উষ্ণশ্বাসে আমার সব জ্ব'লে যাবে,—করালিনী কালী কুপিতা হবেন! এই মা আমি তোমার পা ছুঁয়ে বোল্‌চি, আমি বিবাগী হবো না,—তোমার বউকে এনে ঘর কোর্‌বো।”

এবার বৃদ্ধা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, “বাবা, তা হোলে এইখানেই আমার স্বর্গ হবে।”

প্রবীণা প্রতিবেশিনীটি এইবার সুবিধা পাইয়া কহিলেন, “তাই ত বলি, তাই ত বলি, রামরূপ কি আমাদের এমন অবুঝ যে, সংসারটা একেবারে ভাসিয়ে দেবে?—পোড়া-লোকে এই সব রটিয়েছিল বাছা,—আমার দোষ নেই।”

রামরূপ আর সে কথার কোন উত্তর না দিয়া জননীকে কহিলেন,—“মা তবে অনুমতি দাও, আমি শ্বশুরবাড়ী যাই,—তোমার বউকে আনি।”

মাতা। বাছা, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।

—তা দিন-ক্ষণ দেখ,—শুভদিন দেখে ঘরের লক্ষ্মীকে গিয়ে ঘরে আনো।

রামরূপ। দিনক্ষণ আর দেখ্‌বো কি মা? —আজই যাবো, তুমি অনুমতি দাও।

মাতা। আজ না শনিবার—দিক্‌শূল?

রাম। তোমার আশীর্ব্বাদের জোরে, ও শূল-টুল সব কেটে যাবে।—তুমি বলো, আজই আমি যাই।

মনে মনে বলিলেন, "শনি-মঙ্গলবারেই মায়ের পূজার প্রশস্ত দিন। আমার এ অভিনব মাতৃপূজা; -মা, তুমিই দেখো।"

মাতা ভাবিলেন, "তাই যাক্‌। যখন মন হোয়েছে, আর বাধা দিব না—কি জানি যদি আবার মন ফেরে।"

কিন্তু তখনই আবার কি ভাবিয়া বলিলেন, "তা তাদের একবার খবর দিলে হোত না? তুমি এই নতুন শ্বশুর-বাড়ী যাচ্ছ।"

রামরূপ ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"ও সবের কিছু দরকার নেই মা।"

পরম কালীভক্ত—শক্তি-উপাসক—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর

যুবক রামরূপ—পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যাঁর অলৌকিক সাধনা ও সিদ্ধির কথা বলা হইয়াছে,—'সেই ভক্তাবতার মহাত্মা—মাতৃসাধ-পূরণার্থ শ্বশুরবাড়ী চলিলেন। সঙ্গে বাড়ীর বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য সাধুচরণ রহিল। যে পল্লীতে তাঁহাদের বাস, তাঁহার নাম মনোহরপুর। সেই মনোহরপুর হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে—রামরূপের শ্বশুরবাড়ী। মেটে রাস্তা। যানাদির সুবিধা তেমন নাই। পদব্রজে গল্পগাছা করিতে করিতে—উভয়ে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

সাধুচরণ বলিল, "দাদা ঠাকুর, নতুন শ্বশুরবাড়ী যাচ্চ, সাজ গোচটা একটু ভাল কোল্লে হোত। —গিন্নীমার কথা ত তুমি কানেই তুল্লে না।"

রাম। সাজ-গোচে কি যায়-আসে সাধুচরণ? আড়ম্বর বাড়িয়ে ফল কি?

সাধু। একটু ফল আছে বৈ কি? লোকে যে তাই চায়। খাঁটী সোনায় গহনার গড়ন ভাল জমে না,—একটু পান্ দিতে হয়।

রাম। সে যা দিতে হয়, তুমি দিয়ে দিও,—আমা হোতে ওসব হবে না।

সাধুচরণ বলিতে লাগিল, "দাদাঠাকুরের আমার ঐ এক কেমন রোগ! যাচ্চেন শ্বশুরবাড়ী, —বেনারসী জোড়্‌টাও পোল্লেন না। সেখানে শালী-শালাজ আছেন, শ্বাশুড়ী ঠাক্‌রণ আছেন, আরো পাড়ার কত মেয়েছেলে আছে,—তারা হুন্‌তো-ধুন্‌তো হোয়ে এসে দেখ্‌বে কি না, কাঁচা-সোনার মত রং—অমন নতুন জামাই—পোরে এয়েছেন কি না—একখানা আধ-ময়লা কস্তাপেড়ে ধুতি। হয়ত কেউ মনে মনে হাসবে, কেউ নাক্ সিট্‌কুবে—না, তা আমি সইতে পার্‌বো না।"

সাক্ষাৎ নবীন নীরদকান্তি সুঠাম সুদর্শন রাম—যেন রামরূপেই বিরাজ করিতেছেন। সেই সৌম্য শান্ত সুধীর মূর্ত্তি, সেই তপঃ-প্রভান্বিত উজ্জ্বল অপরূপ রূপ, সেই করুণামাখা মাতৃভাবাপন্ন অপূর্ব্ব মুখমণ্ডল,—সর্ব্বোপরি সেই আকর্ণবিস্তৃত ঢুলু ঢুলু নয়ন—সেই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন দিব্য যোগচক্ষু,—যাহার দিকে চাহিলেই প্রাণ শীতল হয়,—ভক্তির সেই সাক্ষাৎ প্রাণতোষিণী মোহিনী ছবি সম্মুখে; —সাধুচরণ যেন তাহা দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছে না,—তাই আব্‌দারভরে পুনরায় কহিল, "না

দাদাঠাকুর, তোমার "এ বেশে শ্বশুরবাড়ী যাওয়া হবে না!"

"এখন আর না যেয়ে কি করি বলো? এই পাঁচ ছয় ক্রোশ পথ ফিরে গিয়ে ত আর বারাণসীর জোড়্ পোরে আস্‌তে পারি না?"—রামরূপ একটু হাসিলেন। মধুর শুভ্র সে হাসি,—উজ্জ্বল শ্বেত দন্ত-পাঁতিতে মিশিয়া, তাহা বড় মধুর ভাব ধারণ করিল।

কিন্তু সাধুচরণ পাছে মনঃক্ষোভ পায়, তাই তখনই আবার তাহাকে সস্নেহে কহিলেন,—"আচ্ছা সাধুচরণ, সত্যি কোরে বলো দেখি, তোমার সেই বারাণসী জোড়টি সুন্দর, না—আমি সুন্দর? শ্বশুর-বাড়ীর লোকেরা আমায় দেখ্‌বে, না—সেই বারাণসী জোড়টি দেখ্‌বে?"

এ কথায় সাধুচরণ বড় গোলে পড়িল। সে একবার তার দাদাঠাকুরের সেই সস্মিত মুখের দিকে চাহিল। দেখিল,—অনিন্দ্য-সুন্দর দেবদুর্ল্লভ সে রূপ;—সেই রূপের সাগর—টিপি টিপি হাসিতে-ছেন;—আর বার বারাণসী জোড়্‌টার কথা স্মরণ করিল।—মনে মনে কহিল, "ছাই বারাণসী! চাঁদে আর জোনাকি-ই?"

তথাপি প্রকাশ্যে কহিল, "উঁ-হুঁ-হুঁ দাদাঠাকুর, তুমি আমার কথাটা তলিয়ে বুঝ্‌লে না।—এ যে শ্বশুর-বাড়ী ?—শ্বশুর-বাড়ীতে গিয়ে একটু সেজে-গুজে গেরাম্‌ভারি হোয়ে বোস্‌তে হয়।"

"তা তাই হবে।—তোমার ও পুঁট্‌লিতে কি ?"

"রাগ কোর্‌বে না বলো ?"

"সাধুচরণ, আমি কি কারো উপর রাগ করি ?"

"তা আমি জানি—রাগ তোমার শরীরে নেই। তবে তুমি বড় এক-গুঁয়ে ; যে গোঁ ধোর্‌বে, তা না কোরে ছাড়্‌বে না—সেই জন্যে ভয়।"

"না, কোন ভয় নেই—পুঁট্‌লিতে কি আছে দেখি ?"

সাধুচরণ দুই একবার একটু ঢোক গিলিল। একটু আম্‌তা আম্‌তা করিল। শেষ বলিল, "গিন্নী-মা তোমার পরণের জন্যে, লুকিয়ে আমার কাছে এই বারাণসী জোড়্‌টা দিয়েছেন ;—শ্বশুরবাড়ীর কাছ্‌-বরাবর গিয়ে, তোমায় এটি পোত্তে হবে। নইলে তিনি বড় মনোদুঃখ পাবেন।"

মাতৃভক্ত রামরূপ মনে মনে একটু হাসিলেন, মনে মনে একটু কাঁদিলেন। তার পর মনে মনেই

বলিলেন—"হায় মা! তোমার এত সাধ! সন্তানের প্রতি তোমার এমনই মায়া! মমতাময়ী মহাদেবি! আমি যেন তোমার পুণ্যবলেই তোমাকে সুখী করিতে পারি।"

প্রকাশ্যে কহিলেন, "তা সাধুচরণ, যখন মার অত সাধ, তোমার এত জেদ্, তখন ঐ জোড়্টি দাও,—হাত পা ধুয়ে উটি পরি। এদিকেও সন্ধ্যা হোয়ে এলো বোলে।—ঐ না সুমুখে সেই মিঠে-পুকুর?"

"হাঁ দাদাঠাকুর! এইটুকু একটু খর-পায়ে যাই চলো। আমারও বড় তেষ্টা পেয়েচে,—আঁচ্লা ভোরে জল খাবো।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গ্রামের নামও যা, পুকুরের নামও তাই—মিঠাপুকুর। সেই পুষ্করিণী-তীরে রামরূপ, সাধুচরণ সহ পঁহুছিলেন। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। পল্লীর রাখালবালকগণ ধেনু-বৎস লইয়া আবাসে ফিরিতেছে। পক্ষিগণ সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া বাসায় আসিতেছে। লোকের কলরব-কোলাহল অনেকটা শান্ত হইয়া যাইতেছে।

খুব প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। চারিদিকে চারিটি প্রশস্ত বাঁধা-ঘাট। সেই ঘাটের উপর, বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে, শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষশ্রেণী। কাকচক্ষুর মত দীঘীর নির্ম্মল জল। ঈষৎ বায়ুসঞ্চালনে, জল টল্ টল্ ঢল্ ঢল্ করিতেছে। জলের আস্বাদন অতি মিষ্ট, তাই সেই

জলাশয়ের নাম মিঠাপুকুর। পুকুরটির খাতিরে গ্রামেরও ঐ নামকরণ হইয়াছে।

সাধুচরণ পুকুরে পঁহুছিয়া, হাতমুখ ধুইয়া, অঞ্জলি পূরিয়া জলপান করিতে লাগিল। জলপান করিতে করিতে রামরূপকে বলিল, "দাদাঠাকুর, তোমার শ্বশুরবাড়ীর গাঁয়ের সব ভুলতে পার্‌বো, কেবল এই পুকুরটির কথা ভুল্‌তে পারবো না।—আঃ! কি মিঠে জল!"

রামরূপ হাসিয়া কহিলেন, "তা নয় যাবার সময় কিছু জল কাপড়ে বেঁধে নিয়ে যেয়ো না সাধুচরণ ?"

সাধু। দাদাঠাকুরের আমার কেবলি রঙ্গ। তা যেখেনে রঙ্গ কর্‌বার, সেখেনে যত খুসী রঙ্গ কোরো, এখন হাতমুখ ধুয়ে নিয়ে কাপড়টা শীঘ্‌গির ছেড়ে দাও।—শ্বশুরবাড়ীর কোন লোকজন এসে শেষে দেখে ফেল্‌বে ?

রাম। তাতে কি ?

সাধু। তাতে কি ? তবে একটা গল্প বলি শোন। 'একজন বড় লোকের একটি মেয়ে কপাল-দোষে এক গরীব গৃহস্থের ঘরে পোড়েছিল। এক-বার বাপের বাড়ীর কোন কাজের সময়, অন্য অন্য

বোন্‌দের সঙ্গে সেও আসিল। কিন্তু তার গায়ে গহনা-গাঁটী কিছু ছিল না। তাতে সকলে তাকে অনাদর ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কোল্লে। এমন কি, কয় বোনে যখন একত্রে খেতে বসে, গরীব বোলে, তার পাতে, মাছ অবধি দিলে না,—অম্‌নি একটু সোঁটানি-পোঁটানি দিয়ে এয়ো নাম রাখ্‌লে। আর অন্য অন্য বোনেরা তাকে দেখিয়ে বড় বড় মাছের দাগা, কেউ বা মুড়ো—খেতে লাগ্‌লো,—আর মাঝে মাঝে তার গরীবয়ানার কথা তুলে একটু একটু টিট্‌কিনিও দিতে লাগ্‌লো।—বাপের বাড়ী বোসে, আপনার মার পেটের বোন্‌দের এই রকম হেনেস্তা দেখে, তার মনে বড় ধিক্কার জন্মালো। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা কোর্‌লে, যদি ভগবান্ কখন তার দিন দেন, তবে আর একবার বাপের বাড়ী এসে—এ খেদ মিটিয়ে যাবে। কালে তার সময় ফির্‌লো,—তার স্বামী একজন মস্ত বড়লোক হোলো।—সোনাদানা, কোটা-ভিটেয়,—সে তার সকল ভগিনী-দের চেয়ে উঁচিয়ে উঠ্‌লো। সেই সময় একবার সে সখ্ কোরে বাপের বাড়ী এলো। তার অন্য অন্য বোনদেরও আনালে। এবার আর তার আদর-

আয়িত্তির সীমা রইল না। পঞ্চব্যান্নুন ভাত ছেড়ে—শত ব্যান্নুন দিয়ে খাওয়াতে তাকে সাধ্য-সাধনা পোড়ে গেল।—মাছ ছেড়ে জোড়া-মাছের মুড়ো তার পাতে পোড়লো। তখন সেই অভিমানিনী মেয়েটি—এখন এক-গা গহনা গায়—খেতে বোসে—বাপের বাড়ীর সেই সব আত্মীয়দের শুনিয়ে ও দেখিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লো,—"ও খাড়ু, এই মাছের মুড়ো খা; ও রতনচূড়, এই পায়েস খা; ও হীরের বালা, এই পিঠে খা।"—শুধু মুখে বলা নয়,—এক একবার কোরে ঐ সব জিনিসে গহনা-গুলো ঠেকাতেও লাগ্‌লো। তখন তার মা বোন্ পিসী মাসী খুড়ী জেঠী বুঝ্‌লো—ব্যাপারখানা কি। বুঝ্‌লো, গরীবের ঘরে পোড়েছিলো বোলে একদিন মেয়েকে যে হেনেস্তা করা হোয়েছিল, এখন দিন পেয়ে, মেয়ে তার শোধ নিলে!—বুঝ্‌লে দাদা-ঠাকুর! এই দৈন্যে-দশাটাই এমনি!—সাধ কোরে এ লোককে দেখাতে নেই।

দাদাঠাকুর এই গল্প শুনিয়া চক্ষু বিস্তার করিয়া, যেন একটু হাঁফ ছাড়িয়া বলিলেন, "ওরে বাপ্‌রে! সাধুচরণের যে জ্বলজ্ব'লে কাহিনী! আর কি বারাণসী

না পোরে থাক্‌তে পারি ?—দাও ঐ পুঁট্‌লি থেকে কাপড় বার কোরে।”

সাধু। হাঁ, এই ভাল,—এই আমি যাই।

রাম। আমার কিন্তু এখেন থেকে উঠ্‌তে একটু দেরী হবে—সন্ধ্যাহ্নিক না সেরে আমি যাব না।

সাধু। তা আমি গিয়ে তোমার শ্বশুরবাড়ী খবর দিই।—তারা আগ্‌ বাড়িয়ে এসে তোমায় নিয়ে যাক্‌—কি বলো ?

রাম। তোমার যেরূপ ইচ্ছা।

রামরূপ বিশ্রামান্তে হাত মুখ ধুইলেন, উত্তম-রূপে পদ প্রক্ষালন করিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর স্নিগ্ধ হইল। ইত্যবসরে সাধুচরণ তাহার পুট্‌লি হইতে বড় সাধের সেই বারাণসীর জোড়টি বাহির করিয়া প্রভুকে পরাইয়া দিল। প্রকৃতই বড় শোভা হইল। পুকুরপাড় যেন আলো করিল। ভক্ত তাহা-তেই কৃতার্থ। সে এক দৃষ্টিতে প্রভুর সেই মনো-মোহনরূপ দেখিতে লাগিল। সেই সন্ধ্যা-সমাগমে সেই প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা, সেই লোক-কোলাহল-শূন্য নির্জ্জন স্থান, আর সেই শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত বিস্তৃত সোপানাবলীর উপর—কন্দর্পতুল্য পরম সুন্দর—যুবা

রামরূপ—কোমল মসৃণ রেশমের রক্তবর্ণ বস্ত্রে ও উত্তরীয়ে সুশোভিত ;—সাধুচরণের চোখের পলক আর পড়ে না।—সে এক দৃষ্টে সে অপরূপ রূপ-সুধা পান করিতে লাগিল।

রামরূপ হাসিয়া কহিলেন, "সাধুচরণ, আর দেখ কি ? বরের বেশ ত পরাইলে, এখন মন্দিরে গিয়া সংবাদ দাও। নহিলে আজ এই মিঠে-পুকুরের মিঠে হাওয়া খাইয়া থাকিতে হয়,—রাত্রিবাসও এই বৃক্ষতলে করিতে হয়।"

সাধুচরণের যেন চমক ভাঙ্গিল। হুঁসিয়ার হইয়া কহিল, "না দাদাঠাকুর, সে জন্যে ভাবিনে। তোমার শ্বশুরবাড়ী ত ঐ দেখা যায়—আর এক দণ্ডেরও পথ নয়। আমি ভাব্‌চি, সব হোলো,—একছড়া বনফুলের মালা যদি এসময় পাই ?"

"তা হোলে গলায় দাও—না ? ভাল, তোমার যখন সাধ হোয়েছে, তখন্ আমারো পরা হোয়েছে জেনো।"—রামরূপ সস্নেহে এই কথা বলিয়া সেই শ্বেতমর্ম্মর শীতল সোপানের একটি চত্বরে উপবেশন করিলেন। উপবেশনমাত্রেই ধ্যানস্থ হইলেন।

এমন সময় দূরে কে গান গাহিল। পবিত্র

বামাকণ্ঠ-নিঃসৃত অতি-মধুর সেই গান। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় উদ্‌গ্রীব কর্ণে, সাধুচরণ সেই গান শুনিতে শুনিতে চলিল। গায়িকা ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে গাহিতেছে,—

"সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই।
ভজলে অযোধ্যানাথ দোশরা না কোই॥
হসন বোলন চতুরা চাল, অয়েন বয়েন দৃগ্‌ বিশাল,
ভ্রূকুটি কুটিল তিলক ভাল, নাসিকা শোভাই।
কেশরকো তিলক ভাল,　　মান রবি প্রাতঃকাল,
শ্রবণ কুণ্ডল ঝলমলাট রতিপতি ছবিছাই॥
মোতিনকো কণ্ঠমাল,　　তারাগণ উর বিশাল,
মানগিরি শিখর ফোরি　সুরসীর বহিরাই।
বিহরে রঘুবংশ বীর,　　সখা সহিত সরযূতীর,
তুলসীদাস হরষি নিরখি, চরণরজ পাই॥"

গান গাহিতে গাহিতে, গায়িকা সেই সুন্দর সরসীতীরে আসিলেন। যে ঘাট আলো করিয়া রাম-রূপ ধ্যানস্থ আছেন, সেই ঘাটে আসিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু পড়িতে লাগিল। তপ্ত-কাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল গৌরবরণ, সুলক্ষণাক্রান্ত দীর্ঘ অবয়ব, গম্ভীর যোগিনী মূর্ত্তি। বয়স চল্লিশ পার হই-

য়াছে, কিন্তু মুখশ্রীতে অল্প বলিয়া বোধ হয়। বঙ্গ-রমণীর মাধুর্য্য ও পশ্চিমদেশীয়া রমণীর দৈহিক বীর্য্য একাধারে তাঁহাতে বিদ্যমান। রমণী রামাৎ সম্প্রদায় ভুক্তা; অথবা তাঁহার ইষ্টদেবতা কে, তিনিই জানেন। প্রাতে সন্ধ্যায় রাত্রে—সকল সময়েই তিনি ঐ ভক্তিরসাশ্রিত ভজনটি গান করেন। বক্ষে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ একটি পিত্তলময় শ্রীরামচন্দ্র মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি বুকে করিয়া তখনো তিনি ভক্তিভাবময় কণ্ঠে বিভোরা হইয়া গাহিতেছেন,—

"সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই।
ভজলে অযোধ্যানাথ, দোশরা না কোই॥"

ধ্যানস্থ রামরূপ—এই সুধাস্রাবী সঙ্গীতে, 'মা মা' বলিয়া সমাধিস্থ হইলেন।

সে সমাধি-দশা বড় অদ্ভুত। চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত, সর্ব্বাঙ্গে ভাব-তরঙ্গ, মুখে দিব্য জ্যোতিঃ ও ঈষৎ হাস্য, কণ্ঠে অস্ফুট মা মা রব।—যেন সাক্ষাৎ যোগীশ্বর সদাশিব নরদেহে বিরাজিত। কখন বা সে করুণামাখা মাতৃভাবময় মুখে, ভক্তিমতী যশোদার বাৎসল্য ভাবও বিদ্যমান। সমাধি

অবস্থার এই স্বর্গীয় ছবি যে দেখিয়াছে, সেই মজিয়াছে।

আজ এই যোগিনীও মজিলেন। সেই নীরব নির্জ্জন সরসীকূল, সেই মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত সুন্দর চত্বর, সেই চত্বরে বসিয়া সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আধারভূত—গভীর ধ্যানস্থ—ভগবৎ-প্রেমে বিভোর—এই মহাপুরুষ। সান্ধ্যসমীরণ শীতল শীকরকণা সিঞ্চন করিতেছে; ভগবদ্ভক্তের মুখে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে।

জ্যোৎস্নাময়া রজনী। চাঁদে ও কৌমুদীতে মিলন হইয়াছে। প্রকৃতির সেই মধুর মিলন মাঝে, সর্ব্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী, তাঁহার ইষ্টদেবতাকে দেখিলেন। যাঁহাকে দেখিবার জন্য—সংসার ছাড়িয়া, যৌবনে যোগিনী সাজিয়া, শত বাধা ও উপদ্রব সহিয়া, দেশ দেশান্তর ঘুরিয়া, কত সাধু সন্ন্যাসীর উপাসনা করিয়া বেড়াইয়াছেন,—আজ জীবনের মাহেন্দ্র-ক্ষণে, বাঙ্গালার একটি ক্ষুদ্র পল্লীর মাঝে, এই নির্জ্জন সরসীতীরে—তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিলেন। জীবন ধন্য হইল, সাধনা সিদ্ধ হইল।

যোগিনী জানু পাতিয়া—তাঁহার ইষ্টদেবতার

সম্মুখে বসিলেন। যুক্তকরে—অনিমেষ যোগনেত্রে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কত দিনের কত কথাই মনে পড়িতে লাগিল। মুখে কোন কথা নাই, অন্তরেও কোন প্রার্থনা নাই,—কেবল চোখ দিয়া অবিরলধারে প্রেমাশ্রু পতিত হইতে লাগিল।

—"হায়! এই ত আমার নবদুর্ব্বাদল নবীন-নীরদ রাম! এই ত সাক্ষাৎ রাম-রূপ! যে রূপের ধ্যান এতদিন কোরে এসেছি, আজ চর্ম্মচক্ষে তা দেখ্‌লেম। পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ আমার সম্মুখে,—আজ আমার বাড়া ভাগ্যবতী আর কে? স্বপ্ন, আজ তুমি সত্য হোলে।"—মনে মনে এই কথা বলিয়া, সেই সাক্ষাৎ ভক্তিরূপিণী যোগিনী, পুষ্পচন্দনে তাঁহার ইষ্টদেবতাকে পূজা করিতে বসিলেন।

পূজোপকরণ তাঁহার সঙ্গেই ছিল। সেই পিত্তল-নির্ম্মিত রামমূর্ত্তিটিকে,—তিনি প্রাতঃসন্ধ্যায় পূজা করিতেন। পূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। তরুতলে বাস, অনশন ও অর্দ্ধাশনে তাঁহার দিন কাটিত। দেশ হইতে দেশান্তরে, গ্রাম হইতে

গ্রামান্তরে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন। আজ এই ক্ষুদ্র পল্লীতে আসিয়া তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপিত হইল।

ক্ষুদ্র একটি ঝুলি হইতে পুষ্পচন্দন ও একছড়া বনফুলের মালা বাহির করিলেন। পাছে চক্ষের জলে তাহা ধৌত হয়, এই জন্য অতি সাবধানে তাহা সেই চত্বরের এক পার্শ্বে রাখিলেন। বক্ষঃস্থ শ্রীরামচন্দ্র মূর্ত্তিটিকেও একস্থানে রক্ষা করিলেন। মনে মনে মনে বলিলেন, "আজ মূর্ত্তিমান্ রাম-রূপ ভাগ্যে দর্শন হইল, তবে আর কেন,—প্রাণ ভরিয়া আজ এই বিরাট্ বিগ্রহের পূজা করি।"

তারপর আরো অগ্রসর হইয়া মনে মনে কহিলেন, "যদি ভাগ্য প্রসন্নই হইল, তবে এ দেবদুর্লভ ভাগবতীতনু একবার স্পর্শ করি,—অপরাধ লইও না নারায়ণ!"

এই বলিয়া ভক্তিভরে রামরূপের সেই দেব-অঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত করিতে লাগিলেন। স্বহস্তে সযত্নে রচিত বনফুলের মালা গলায় পরাইলেন। তারপর যথারীতি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহার পদে পুষ্পাঞ্জলি দিতে দিতে গদগদকণ্ঠে গান ধরিলেন,—

"সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই।
ভজলে অযোধ্যানাথ, দোশরা না কোই ॥"

অতি ভক্তিমাখা সুমধুর কণ্ঠে এই গান গীত হইয়া সেই নৈশগগন প্রতিধ্বনিত করিল। ধীরে আরম্ভ হইয়া, ক্রমে পঞ্চমে—সপ্তমে ইহা উঠিল। গায়িকার হৃদয়ে ভক্তির কৌমুদীরশ্মি, বাহিরেও সেই রশ্মির বিকাশ—দুই সুর এক হইল।

সঙ্গীতের সেই সম্মোহন স্বরে, এবং ভক্তের গভীর ভক্তি-আকর্ষণে, এবার রামরূপের সমাধি ভঙ্গ হইল। সম্মুখে স্বর্গের ছবি দেখিলেন। অতি স্নেহমাখা-স্বরে, অমৃতশীতল, কণ্ঠে কহিলেন, "কে তুমি মা, সুধামাখা কণ্ঠে আমায় রামনাম শুনাইতেছ?"

"বাবা, আমি তোমার পদাশ্রিতা ভক্তিহীনা রমণী।—তোমার জন্যেই সংসারত্যাগিনী।"

"কেন মা, সংসার ত্যাগ করিয়া আসিলে? এ অধম, নিরক্ষর, দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান দ্বারা তোমার কোন্ ইষ্টসিদ্ধি হইবে?"

"ইষ্টসিদ্ধি কি, তা জানি না। তবে জন্মান্তরীণ সুকৃতিফলে ইহাই জানিয়াছি, তুমিই আমার ইষ্ট,

তুমিই আমার সিদ্ধি।—পতিতপাবন! আর আমায় বঞ্চনা কোরো না। আমি তোমায় চিনেছি,—তোমার কৃপায় তোমায় চিনেছি।”

“মা, তোমার ভ্রম হোচ্চে। তুমি সমুদ্র ছেড়ে ক্ষুদ্র জলাশয়ের কাছে রত্নের আশায় এসেছ। আমিও মা ভক্তির কাঙ্গাল;—ভক্ত-কল্পতরু ভগবানের দর্শন আশায় জীবন গোঁয়ালেম;—কৈ, ভাগ্যে ত শ্রীহরি-দর্শন হোলো না। তাই মা মা কোরে কাঁদি, মা-ই যদি তাঁকে দেখিয়ে দেন।—তুমি কি মা, হরিকে দেখেছ?”

“হরি কে, তা জানি না,—তবে সাক্ষাৎ রাম-রূপ আমি দেখেছি। রামরূপে যদি ‘হরি’ থাকেন, তবে সে হরিকেও আমি দেখেছি। প্রভু, আমি তোমায় দেখেছি,—আর কিছু দেখ্‌বার সাধ নেই।”

“কল্পতরু কালী-মাকে একবার জানিয়ে নিলে হোত না?”

“জানাতে হয় ত, তুমিই জানিয়ো,—আমার আর জানাজানির দরকার নেই। এখন তুমিই আমার কালী,—তুমিই আমার হরি,—তুমিই আমার রাম।”

ভক্তি-গদগদকণ্ঠে এই কথা বলিয়া, সেই সিদ্ধা, সাধিকা, ব্রহ্মজ্ঞান-গরীয়সী, ভক্তিমতী যোগিনী,—সেই প্রচ্ছন্ন যোগীশ্বর রামরূপের চরণে নিপতিতা হইলেন। রামরূপ দেখিলেন, আর আত্মগোপন বৃথা,—এ খাঁটী সোনা। একে যত পোড়্ খাওয়াইবে, ততই উজ্জ্বল হইবে। ভক্তি-চুম্বকে এর হৃদয় ভরা; কৌশল-রূপ লোহার সাধ্য নাই যে, এর আকর্ষণের হাত এড়ায়।

অগত্যা রামরূপ একটু ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিলেন, "তবে মা, একটি বিষয়ে প্রতিশ্রুত হও,—পালন করিবে?"

"কি, অনুমতি করুন।"

"মার আমার এ প্রচ্ছন্ন লীলার কথা প্রকাশ করিতে পারিবে না।"

যোগিনী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "মা—কে?—আমি একমাত্র তোমায় জানি। তা তোমার স্বরূপ-তত্ত্ব, আমি না করি, আর কেউ প্রকাশ কোর্‌বে। বস্ত্রাচ্ছাদিত আগুন কতক্ষণ লুকানো থাকে? পারিজাত পুষ্পের সৌরভের কথা কাউকে বলিয়া দিতে হয় না।"

রাম-রূপে দর্শন দিলে, তবে একবার যুগলরূপ দেখাও।—রামসীতা মূর্ত্তি একাসনে দেখ্‌লে, আর জন্মজ্বালা থাক্‌বে না।”

“কেন, এই ত তুমি বোল্‌ছিলে, এখন মারি আর রাখি, তোমার কোন খেদ নাই?”

ভক্ত নিরুত্তর, চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিতে লাগিল।

করুণাসাগর ভক্তাবতার বলিলেন, “থাক্, আর কেঁদো না, কেঁদো না, তোমার কান্নায় আমারো কান্না পাচ্চে।—তোমার এ কামনাও পূর্ণ হবে। কিন্তু একটা বড় জ্বালা আছে। বিষের তুল্য বাক্য-জ্বালা সইতে হবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে যা বড় অপবাদ, বড় নিন্দা, সেই অপবাদ নিন্দা, তোমায় অঙ্গের আভরণ কত্তে হবে—পার্‌বে কি মা?”

ভক্তিমতী যোগিনী একটু স্তব্ধ থাকিয়া ধীরভাবে বলিলেন, “পার্‌বো। যখন বুকে এতটা পাষাণ-ভার সহিয়েছি, তখন কুলোকের দুটো কুবাক্য-বাণও সহিতে পার্‌বো। কেবল একটা ক্ষোভ,—ভগবান্! এ হতভাগিনীর জন্যে তোমায়ও সে অপবাদ সহিতে হবে।”

স্মিতমুখে জীবন্মুক্ত পুরুষ কহিলেন, "ওসব সওয়া অভ্যাস আমার আছে। সর্ব্বকালেই দুর্ম্মুখ ও জটিলে-কুটিলে আমার জুটে যায়,—নইলে লীলার পোষ্টাই হয় না।"

অপ্রতিভ যোগিনীরও যেন তখন চমক ভাঙ্গিল, —"আরে মূঢ় অজ্ঞান রমণি! কার সাম্‌নে কি কথা বোলচ? যে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ জীবের গতি-মুক্তির জন্যে দেহধারণ অবধি কোত্তে পেরেছেন, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের খাতিরে, দুটো অপবাদ আর তিনি নিতে পার্‌বেন না? দ্বাপরের কৃষ্ণলীলা, ত্রেতায় রামলীলার অপবাদের চেয়েও কি এ অধিক?"

আলো হাতে, দুই একজন লোক সঙ্গে, সাধুচরণ আসিয়া সেইরূপ আব্‌দার ভরে আদর করিয়া আসিয়া ডাকিল, "দাদাঠাকুর,—বলি ও দাদাঠাকুর! ঘাটে ব'সে কি আজ এই সারারাত ধ্যানে কাটাবে? ওঠো দেখিন্।—এ কি! এই যে দেখ্‌চি আমার সকল সাধই মিটেছে,—মালাচন্দন দু-ই ও শ্রীঅঙ্গে উঠেছে।—কেরে ভাগ্যবান্, এমন যোজনা কোরে দিলি? (সহসা দীর্ঘাকারা যোগিনীকে দেখিয়া ভীত ও চমকিত ভাবে) তুমি কে মা শুভচণ্ডী?"

যোগিনী। বাছা, আমি পথিক।

সাধুচরণ। (স্বগত) আরে রাম, রাম, রাম! আজকের রাতটা যেন ভালয় ভালয় কেটে যায়। ঘরে গিয়ে হে বাবাঠাকুর! তোমায় ভাল কোরে পূজো দেবো। রাম, রাম! হে বাবা ভূত,—না, হে মা শাঁকচুন্নি,দোহাই তোমার,—আমার ঘাড় ভেঙ্গো না!—রাম, রাম, রাম!

কম্পিত হস্তে আলোক লইয়া অগ্রে সাধুচরণ ও লোকদ্বয়, পশ্চাৎ ভক্তাবতার রামরূপ ও অদৃষ্টপূর্ব্ব যোগিনী।

সাধুচরণ। (যোগিনীকে সঙ্গে আসিতে দেখিয়া) আরে মোলো, নড়েনা যে? সঙ্গ নিলে নাকি? —রাম, রাম, রাম!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:০*০:—

রামরূপের শ্বশুরালয় আগমনের সংবাদ, অল্পক্ষণ মধ্যে গ্রামময় রাষ্ট্র হইল। ক্ষুদ্র গ্রাম, পল্লীটি আবার ততোধিক ক্ষুদ্র। পাঁচ সাত ঘর ব্রাহ্মণ, ঘর দুই চার কায়স্থ, বাকী দশবিশ ঘর অন্যান্য জাতির বাস। একঘর ধনাঢ্য কৈবর্ত্ত তন্মধ্যে প্রধান। তাঁহারাই গ্রামের জমিদার। মিঠাপুকুর নামে দীঘী ও ঘাট, তাঁহাদেরই প্রতিষ্ঠিত।

রামরূপ যখন শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া পঁহুছিলেন, তখন দণ্ড দেড়েক রাত হইয়াছে। জ্যোৎস্নারাত, তায় ফাল্গুনমাস, তায় নূতন জামাই নূতন শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে;—সুতরাং গ্রামময় একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। বিশেষ বিবাহের পর আট

বৎসরের মধ্যে, জামাই এ-মুখো হন নাই। সুতরাং বিবাহ পুরাতন হইলেও জামাই সেই নূতনই আছেন। তারপর এক গুজব উঠিয়াছিল যে, জামাই কেমন এক ক্ষেপাটে রকমের—রাতদিন পূজাহ্নিক নিয়েই আছে, আর আপন মনে মা মা ক'রে কাঁদে।—কেউ বলে সন্ন্যাসী হবে, কেউ বলে পাগল হবে, কেউ বলে বউকে নিয়ে ঘর কোর্‌বে না। কেন না, তার মুখের বুলিই এই, —'কামিনাকাঞ্চন বিষবৎ পরিত্যজ্য।'—সেই জামাই যখন এত দিন পরে, বিনা আহ্বানে, কোনরূপ সংবাদাদি না দিয়াই হঠাৎ আসিয়াছে, তখন গ্রামশুদ্ধ লোকের যে কিরূপ কৌতূহল ও ঔৎসুক্য হইতে পারে, তাহা সকলেই বুঝিতেছেন।

পুরুষ অপেক্ষা আবার মেয়ে-মহলের কৌতূহল-আগ্রহ দশগুণ অধিক। তাঁহারা যেমন কাক-মুখে এ কথা শুনিলেন, অমনি যে যে দিক্ দিয়া পারিলেন, ঘোষালদের বাড়ী অভিমুখে ছুটিলেন। ঘোষাল-গিন্নী জামাতার এই আকস্মিক আগমন-সংবাদে হর্ষে বিষাদে তুল্যরূপে দোতুল্যমানা হইতে লাগিলেন। জামাইকে কি খাওয়াইবেন, কি পরাইবেন,

কোথায় বসাইবেন,—এই সব ভাবনার কাল্পনিক দুঃখ ও উৎকণ্ঠায় তিনি অধীরা হইয়া পড়িলেন। আবার পরমুহূর্ত্তে কন্যার সুখ-সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া এবং প্রতিবেশিনী রমণীগণের উল্লাস-আহ্লাদ দেখিয়া, একা দশ জনের উৎসাহে, জামাতার আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থায় মনোযোগিনী হইলেন।

বিধবার আর দ্বিতীয় সন্তানসন্ততি কিছুই নাই। দুই বৎসর হইল, স্বামী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। যজন-যাজন কার্য্যে তিনি কিছু রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং গ্রাসাচ্ছাদনের ভাবনা বিধবার ছিল না। একমাত্র প্রাণাধিকা কন্যা শিবাসুন্দরীকে লইয়া তিনি সচ্ছলেই দিনযাপন করিতেন।

ভাবনা ও মনঃকষ্ট ছিল,—তাঁহার কন্যাকে লইয়া। অমন সোনার প্রতিমা—শিবতুল্য স্বামীলাভ করিয়াও স্বামীর ঘর কি স্বামি-সন্দর্শন অবধিও করিতে পারিতেছে না,—এ দুঃখ তাঁহার হৃদয়ে অহর্নিশ জাগরূক ছিল। কত সাধ্য-সাধনা, কত অনুনয়-বিনয় করিয়া তিনি জামাতাকে আপন বাটিতে আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন;—কত লোক

দিয়া কত চিঠিপত্র তিনি লিখাইয়াছেন ;—বেহানের নিকট কত কাকুতি মিনতি করিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছেন ;—কিছুতেই কিছু হয় নাই।—এমন কি, তাঁহার স্বামিবিয়োগের সময় ও তাহার পরেও যে একবার খোঁজ লয় নাই ;—সেই জামাই কিনা আজ সহসা—একরূপ সাধিয়া তাঁহার বাটিতে উপস্থিত ;—বিধবা হর্ষে দুঃখে বিষাদে এবং কিঞ্চিৎ ভয়ে—একরূপ বিহ্বলা। যাইহোক, পাড়ার পাঁচজনের যত্নে ও উৎসাহে, তাঁহার জামাই-আদরের কোন বিশৃঙ্খলা হইল না,—বরং আদর আপ্যায়ন যত্ন একটু অধিক মাত্রাতেই হইবে—ভাবিয়া তিনি পুলকিত হইলেন।

আর কন্যা শিবাসুন্দরী ভাবিতেছেন,—আজ তাঁহার শিবপূজা সাঙ্গ হইবে,—সাক্ষাৎ শিবস্বামিসন্দর্শনে তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে। অবশ্যই কপালের কোন ভোগ ছিল, তাই এতদিন দেবদর্শন তাঁহার ভাগ্যে হয় নাই।

আট বৎসর বয়সের সময় তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, আর আজ ষোড়শ বৎসর বয়সে তিনি পতির পুণ্যমুখ দেখিবেন। ধীরা, নম্রা, প্রখর-অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্না তিনি ; পরশমণির স্পর্শে তিনি

সোনা হইয়াছেন ;—তাঁহার বিলক্ষণ মনে আছে, সেই বিবাহের রাত্রে, বাসর-শয্যায়, তাঁহার পতি-দেব চুপি চুপি তাঁহাকে কি মন্ত্র দিয়া গিয়াছিলেন,—তাহা প্রকাশ করিতে নিষেধও করিয়াছিলেন;—সেই সব কথা আজ মনে পড়িতে লাগিল। সেই প্রাণবল্লভ—ধর্ম্মস্বামী—সাক্ষাৎ ঈশ্বর—আজ তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছেন,—তাঁহার তপস্যার ফল ত তিনি দিতে পারিবেন ?

ভক্তিমতী শিবাসুন্দরী তাহাই ভাবিতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন,—"আমার স্বামী সাক্ষাৎ যোগীশ্বর ;—আমাকে তাঁর যোগ্য সহধর্ম্মিণী করিয়া লইতে চান। সেই জন্যই এতদিন আমাকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপরায়ণা তপশ্চারিণীবেশে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। অন্যে যা বলে বলুক, আমি তাঁহাকে চিনি। নিজগুণে তিনি আমাকে চিনাইয়াছিলেন, তাই চিনি।—হে মহেশ্বর! আজ কি তোমার চরণে পরীক্ষা দিতে পারিব ? আমার কি সময় হইয়াছে ?"

ষোড়শী সুবেশা মাতা শিবাসুন্দরী নিবিষ্ট মনে ইহাই চিন্তা করিতেছিলেন। সঙ্গিনী ও রঙ্গিণীগণ

বিবিধ প্রকারে তাঁহাকে সাজাইয়া তাঁহার চিত্ত-রঞ্জনের চেষ্টা করিতেছিল। মাতা ও বর্ষীয়সী কামিনীগণ আসিয়া তাঁহাকে সামান্যা রমণীর ন্যায় স্বামীর মন হরণের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতে তৎপর হইলেন। তিনি কাহাকেও কিছু বলিলেন না,—নারীধর্ম্মোচিত আপন লজ্জানম্র সঙ্কোচে শোভাময়ী হইয়াই পতির চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত রহিলেন।

সাধুচরণ সঙ্গে রামরূপ আসিলেন। শ্বশুরালয়ে একটি ক্ষুদ্র চণ্ডীমণ্ডপ ছিল, সেই সজ্জিত চণ্ডীমণ্ডপ আলো করিয়া তিনি বসিলেন। কন্দর্পতুল্য উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় সে রূপ; রূপ দেখিয়া স্ত্রীপুরুষ সকলে মুগ্ধ হইল। কিছুক্ষণ সকলেই নির্ব্বাক্ রহিল। ক্রমে পাড়ার পাঁচটি লোক আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিল। তাহারা জামাতার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিল।

কিন্তু অধিকক্ষণ এ ভাব থাকিল না,—স্বভাবের স্বরূপমূর্ত্তি শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িল। কেহ রঙ্গ-রহস্য করিল, কেহ ফষ্টি-নষ্টি জুড়িয়া দিল, আর কেহ বা দুই একটা গ্রাম্য-রসিকতা আবৃত্তি

করিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া—পঙ্কিল রস-বিষ উদ্গীরণ করিতে লাগিল। শুদ্ধ ও সংযতাত্মা রামরূপ, সহজেই তাহা উপেক্ষা করিতে পারিলেন। কেবল তাঁহার সেই প্রাচীন ভৃত্য সাধুচরণটি আকার-ইঙ্গিতে মধ্যে মধ্যে একটু আধটু অশিষ্টতা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। সে অশিষ্টতা তাঁহার প্রতি নয়,—তাঁহার সেই শিষ্যা ও সঙ্গিনী—সেই অপরিচিতা যোগিনীকে লক্ষ্য করিয়া। কেননা সাধুচরণের যেন একটা দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে,—এই দীর্ঘাকারা বিদেশিনী, হয়,—কোন মায়াবিনী, নয়—প্রচ্ছন্না প্রেতিনী,—নইলে নির্জ্জন দীঘীর পাড়ে,ঠিক্ সাঁজের বেলা—তার দাদাঠাকুরের সঙ্গ লয় কেন?

দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন রামরূপ সাধুচরণের এ ভাব লক্ষ্য করিলেন। প্রথমতঃ তাহার অজ্ঞতা ও চিত্ত-দুর্ব্বলতার জন্য একটু দুঃখিত হইলেন। শেষ তাহাকে শোধ্রাইবার জন্য, মধুর ভৎর্সনা বাক্যে জনান্তিকে কহিলেন, "সাধুচরণ, ছি! ও কর কি? কাহাকে উপহাস করিতেছ? সর্ব্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী উনি, উঁহাকে রহস্য করিলে মহাপাপ হয়। যা

করিয়াছ করিয়াছ—আর ঐ অসদ্‌বুদ্ধির প্রশ্রয় দিও না।”—দাদাঠাকুরের এই একটু খানি ভৎর্সনায় সাধুচরণের মুখ—এই এতটুকুঁ হইয়া গেল,—সে আর ঘাড় তুলিতেই পারিল না।

এখন, এই সংসার-চিড়িয়াখানায় পাঁচরকমের জীব আছে। ধর্ম্মভাবময় গম্ভীরপ্রকৃতি রামরূপের সহিত কথা কওয়ার তেমন সুবিধা হইবে না ভাবিয়া, যারা জামাই-রঙ্গের সাধ মিটাইতে না পারিয়া ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, তাদের এখন কিছু সুবিধা হইল। একটি জীব সর্প-চক্ষু লইয়া নিবিষ্টভাবে সাধুচরণের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল; তারপর চোরের মত কান খাড়া করিয়া—যখন তাহার প্রতি রামরূপের শাসনবাক্য শুনিল, তখন সে পাইয়া বসিল। ভারি খুসী হইয়া সঙ্গীদের শুনাইয়া বলিল, “তা জামাই বাবু, চটিলে কি হইবে? শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা যায়? সাধাচরণের অপরাধ কি?—যা সত্য ব্যাপার, তা সকলের চোখেই পড়ে।—আমরা কি আর সে মূর্ত্তি দেখিনে মনে করেন?”

“কি হে, কি?”—সঙ্গীদের মধ্যে, ভারি একটা উৎসাহ ও চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল।

"না, এমন কিছু নয়, বাবুজী নূতন শ্বশুর-বাড়ী এলেন,—সঙ্গে আনিলেন একটি ভৈরবী!"

"দূর্ মিন্‌সে! ভৈরবী আবার কে?"

"দেখনি ত মিঞা! দেখ্‌লে তোমারও ভৈরব সাজ্‌বার সাধ হয়।"

"বলো কি,—সত্যি নাকি?"

"জামাই বাবু, তাতে বেশ শিয়ানা—তক্কে তক্কে তাকে অন্দরে পাঠিয়ে দেছেন,—যেন কে, কি বৃত্তান্ত, কিছুই জানেন না।"

"এমন!—মাইরি?"—বলিয়া একটা বানর এক লম্ফে সভা ত্যাগ করিয়া উঠিল এবং অন্দরে—সেই স্ত্রীসমাগমস্থলে ভৈরবী দেখিতে ছুটিল।

প্রথম বানর বান্দুরে-হাসি হাসিয়া বলিল, "যাচ্ছ বটে চাঁদ, কিন্তু থাই পাবে না। মাথায় তোমার ডবল!"

"দূর! মেয়েমানুষ নাকি আবার এম্‌নি ঢেঙ্গা হয়?"

"সে মেয়ে কি হিজ্‌ড়ে, তাই বা কে জানে?"

আর এক বানর দীর্ঘ দন্তপাটী বাহির করিয়া কহিল,—"বলো কি, আমার যে এখনো খাওয়া হয়

নি? সে মুখ দেখ্‌লে যে হাঁড়ী ফাট্‌বে? (জনান্তিকে প্রথম বানরের প্রতি) তামাসা রাখো,—বাবুদের অতিথিশালায় সেই সকালে যাকে দেখিছিলুম, সেই নয় ত?"

প্রথম। (ঐরূপ জনান্তিকে) সেই—কিন্তু কথাটা এখন ভেঙ্গো না। তা হোলে মজা হবে না। জামাইকে একটু অপ্রস্তুত করা যাবে না।—আরে বাপুরে! নতুন জামাই এয়েছিস, ভাল কোরে হেসে খুসে সকলের সঙ্গে কথা ক,—গান টান গা,—তা নয়, কেবল মুখখানা গোঁজ্ কোরেই আছে। (স্বগত) আর সত্যি কথা বোল্‌তে কি, অত রূপের বাখ্যানা,—সকলের মুখেই 'আহা মরি'—আমার বরদাস্ত হয় না।

সাধুচরণ ত এই সকল দেখিয়া শুনিয়া একেবারে মাটীর সঙ্গে মিশিয়া গেল। ভাবিল, "কি ঝক্‌মারিই কোরেছি! আমার কান্না পাচ্চে।—দাদাঠাকুর, আমায় মাপ করো,—এই নাকমলা—কানমলা।"

এদিকে যে বানর অন্দরে ভৈরবী দেখিতে ছুটিল, সে এক প্রবীণার তাড়া খাইল,—"তোমার ত দেখ্‌চি বাছা একটু আক্কেল নেই? এতগুলি ভদ্র-

লোকের মেয়ে আজ একত্র হোয়েছে,—বাবুদের বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত এয়েচে,—তুমি কোন্ সাহসে আজ অন্দরে ঢোক ?”

তখনি কিন্তু আর এক আধা প্রবাণা—সেই বানরের পক্ষ সমর্থন করিয়া, একটু নোলকাছি দিয়া কহিলেন,—“তা তুমি অমন করো কেন ? নীলু আমাদের কচি ছেলে,—এলোই বা অন্দরে !”

“তোমার বোন্ সব বাড়াবাড়ি : তিন ছেলের বাপ,—কচি ছেলে আবার কি ?”

“তা হোক্ ব্যানে, অমন কোরে তুমি লোকের উপর কর্কশা হোয়ো না।”

“ঘাট্ মান্লেম ভাই, তোমার আক্কেল তোমার থাক্।”

এদিকে ষোড়শী শিবাসুন্দরী—যেখানে সঙ্গিনাগণসহ সাক্ষাৎ গৌরীমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন,—যোগিনী গিয়া, একটু তফাতে দাঁড়াইয়া, অনিমেষ নয়নে তাঁহাকে দেখিতেছিলেন। সে চোখের পলক আর পড়ে না,—এমনি ভাবে, এমনি ভক্তি-বিগলিত অন্তরে, সেই মাতৃমূর্ত্তি অবলোকন করিতেছেন। ‘দেখিতে দেখিতে তাঁহার দুই চক্ষু

প্রেমাশ্রুপূর্ণ হইল। তাঁহার হৃদ্‌কমলে সীতাসতীর পূর্ণমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল। আর কিছুক্ষণ পরে, একাধারে রামসীতার যুগলরূপ প্রাণ ভরিয়া দেখিতে পাইবেন ভাবিয়া, তিনি পুলকিত ও রোমাঞ্চিত-কলেবর হইলেন। ভক্তিভরে ভূমিষ্ঠ হইয়া—সেই রামগতপ্রাণা যোগিনী—সেই রূপের প্রতিমাকে প্রণাম করিলেন। আদ্যাসতী ভগবতীর মত সে রূপ;—সেই রূপের চরণে প্রণতা হইলেন।

নিকটে কন্যার মাতা দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি একটু ত্রস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"বাছা, বাছা, ও করো কি,—করো কি ? ওতে মেয়ের আমার অকল্যাণ হবে। তুমি সন্ন্যাসিনী, আমার জামাই-মেয়েকে আশীর্ব্বাদ কোরে যাও বাছা।"

যোগিনী। মা, তোমার যিনি কন্যা, তিনি সকলেরই নমস্যা; তিনিই সকলকে আশীর্ব্বাদ কোর্‌বেন।

"অমন কথা বোলো না বাছা, আমার বুক কাঁপে।—জামাইকে আমার দেখেছ ?"

"দেখেছি! অগ্রে সে রাম-রূপ দর্শন কোরে সতীলক্ষ্মী সীতাদেবীকে দেখ্‌তে এসেছি। মা,

আমার আর একটি সাধ আছে, পূরিয়ো—তোমার ভাল হবে।"

শিবাসুন্দরী এবার করুণানয়নে একবার যোগিনীর প্রতি চাহিলেন। দৃষ্টি প্রসন্নময়ী; সে প্রসন্নদৃষ্টি দর্শনে যোগিনী ধন্যা হইলেন।

শিবার জননী বলিলেন, "কি মা, কি? তোমার কথা শুনে গায় কাঁটা দেয়;—কোন ভয় নেই ত?"

"ভয়—অমন রত্নগর্ভা যিনি, তাঁর আবার ভয়? মা! নিজে অভয়া তোমার ঘরে বাঁধা,—তোমার আবার ভয়?"

বিধবা—ঘোষাল-গৃহিণী এবার প্রকৃতই কিছু ভয় খাইয়া—মনে মনে বলিলেন, "মা মঙ্গলচণ্ডি, রক্ষা কোরো,—জামাই যেন মেয়েকে সুচক্ষে দেখে।—কে এ যোগিনী? ছদ্মবেশে কোন দেবী ত ছলনা কোত্তে আসেন নি?"

(বলা বাহুল্য, নূতন জামাই দেখিতে এ সময় অনেক রকমের লোক তাঁহার বাটিতে আসিয়াছে,—একরূপ অবারিত দ্বার।)

প্রকাশ্যে কহিলেন, "তা মা, যদি দয়া কোরে এ

পুরী পবিত্র কোরেছ, ত আজ রাত্রি—এইখেনেই থেকো।”

“থাকিব বলিয়াই আসিয়াছি মা,—আমায় একটু স্থান দিও।”

“রাত্রে কি জলযোগের আয়োজন কোর্‌বো মা?”

“কিছুই না। আমি একাহার করি,—প্রাতে বাবুদের অতিথশালায় মা-অন্নপূর্ণার প্রসাদ পেয়েছি।”

“তবু—কিছু খাবে না মা?”

“খাবো। যা খাবো, তার আয়োজন আমি নিজেই কোরে নেবো—আমায় একটু থাকিবার স্থান দাও মা।”

“ঠাকুরঘরের ঐ রোয়াকে থাক্‌তে পার্‌বে না মা?”

“তা হোলে ত বাঁচিয়া যাই।—কি ঠাকুর মা?”

“রঘুনাথ জী।”

যোগিনী মনে মনে বলিলেন, “আঃ! আমার সোনার স্বপ্ন সফল হোলো। আমি সাক্ষাৎ রাম-সীতার যুগলমূর্ত্তি এইখানে বোসেই দেখ্‌বো।”

কি জানি কেন, শিবাসুন্দরীর হঠাৎ মনে হইল, —"এই কি সেই সরমাসুন্দরী?—অশোকবনে যিনি সীতার চিরসঙ্গিনী ছিলেন?—হায়! জন্মান্তরীণ স্মৃতি!"

প্রকাশ্যে কহিলেন, "দেবি, আপনাকে কি নামে ডাক্‌বো?"

যোগিনী একটু স্তব্ধ থাকিয়া উত্তর দিলেন,— "সরমা। কিন্তু মা, আমি দেবী নই,—সামান্যা মানবী।"

শিবা অবাক্ হইলেন। স্বামী প্রদত্ত ইষ্টমন্ত্রের প্রভাব বুঝিলেন। বুঝিলেন, শিবশক্তি এক হইয়াছে,—এখন তিনি স্বামীর প্রয়োজনে আসিবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—ঃ০ঃ—

রামরূপ অন্দরে আসিলেন। বামাকুল তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। প্রতিবেশী-সম্পর্কে শ্যালিকাকুল, রঙ্গরস রসিকতায়, তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। শ্যালিকাও নয় কিংবা শালাজও নয়—অথবা তামাসা করিবার কিছুমাত্রও সুবাদ নাই, বরং তাহাতে দোষ হয়,—এমন সব রঙ্গিণীরাও তাঁহার গা-ঘেঁসিয়া বসিয়া—ফষ্টি-নষ্টি জুড়িয়া দিলেন। শেষ এমন সব কথাবার্ত্তার আলোচনা চলিতে আরম্ভ হইল যে, রামরূপের সেখানে তিষ্ঠান ভার হইয়া উঠিল। 'তারা' 'তারা' —'মা' 'মা' বলিতে বলিতে তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

একজন প্রগল্‌ভা রমণী আসিয়া তাঁহার হাত

ধরিয়া বসাইলেন। সোহাগভরে কহিলেন,"ছিঃ ভাই! নতুন শ্বশুরবাড়ী এয়েচ, রাগ কোত্তে আছে কি?"

"মা, আমি তোমার সন্তান;—মিনতি করি, আমার হাত ছাড়ো।"—রামরূপ প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া এই কথা বলিলেন।

আর এক রঙ্গিণী অমনি আরো যেন পাইয়া বসিয়া, হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া বলিলেন, "ও ভাই রাম! কারে কি সম্বোধন কোরে ফেল্‌লে? বিধু যে তোমার শালী সম্পর্কে?"

"আপনারা সকলেই আমার মা,—আমায় ক্ষমা করুন।"

"ওমা, এমন তো দেখিনে গো!—ঘেন্নার কথা, লজ্জার কথা, কাকে কি বলে গো!"—এক প্রবীণা নাকে কাপড় দিয়া, যেন 'হ্যাক্‌-থু' করিবার উপক্রম করিলেন।

আর একজন আগাইয়া গেলেন, তিনিও ঐরূপে প্রত্যাখ্যাতা হইয়া নূতন বিশেষণে ভূষিত করিলেন, —"জামাইটে ক্ষ্যাপা নাকি?"

বিলাসমণি বলিল, "শুধু ক্ষ্যাপা নয়,—মাকাল ফল!"

মুক্ত বলিল, "হাঁ, বোলেচিস ভাই, ঐ মাকাল ফল—উপরেই শুধু চ্যাকোন্-চোকোন্।"

ত্রিপুরাসুন্দরী যেন তাহাতেও নারাজ।—নাক সিট্‌কাইয়া বলিলেন, "তা এমনই বা কি 'উপর চ্যাকোন্-চোকোন্?' আমার বোন্‌পোকে ত দেখনি,—তার রূপ দেখ্‌লে বোল্‌তে—'কিসে আর কিসে।'

নয়নতারাও অমনি সুর ধরিল,—"তা বোলেছ বটে।—প্রথম শ্বশুরবাড়ী এলে সকলেই অমনি একটু গা মেজে-ঘোসে আসে।"

রামরূপ ভাবিতেছেন,—"বাঁচ্‌লুম। যদি এ রকম কোরেও মনের ঝাল ঝেড়ে সোরে পড়ে।"

কিন্তু তাঁর বৃথায় সান্ত্বনা। আবার একদল আসিয়া,তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া, নবরঙ্গরসে মাতাইতে প্রয়াসী হইলেন। তাঁহাদের অগ্রণী যিনি, তিনি একেবারে লজ্জার মাথা খাইয়া, জামাতার ক্রোড়ে বসিবার উপক্রম করিলেন।

মাত্রা চরমে উঠিতেছে দেখিয়া,বেগতিক বুঝিয়া, মাতৃমন্ত্র-উপাসক, পরম সাধক, গম্ভীর 'মা মা' রবে সমাধিস্থ হইলেন। এবার সকলে ভীত'অন্তরে একটু

সরিয়া দাঁড়াইল। সেই সমাধি অবস্থায় গম্ভীরস্বরে তিনি সকলকে শুনাইয়া বলিলেন, "কামিনী—জননী"—এই মন্ত্র আমি সার করিয়াছি ; দোহাই মা তোমাদের, আমায় কেহ মন্ত্রভ্রষ্ট করিও না।"

একজন ভক্তিমতী সাত্ত্বিকপ্রকৃতি প্রবীণা, তাঁহার এ ভাব লক্ষ্য করিলেন। বুঝিলেন, এ লোক সামান্য নয়,—জামাতা বেশে—স্বয়ং পুরুষোত্তম ছলনা করিতে আসিয়াছেন। ভয় ও ভক্তিতে তিনি অভিভূতা হইলেন। জনান্তিকে একজনকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ওরে, আমাদের বাড়ীর সকলকে শীঘ্‌গির সোরে যেতে বল্, সাধুর কোপে পড়্‌লে সর্ব্বনাশ হবে।—দেখ্‌ছি ইনি সাক্ষাৎ শিব।"

তখন আর এক প্রবীণা, অপেক্ষাকৃত একটু কোমলা হইয়া, রামরূপকে শুনাইয়া কহিলেন, "ভাল, আমরাই যেন শ্বাশুড়ী সম্পর্কে—তোমার মাতৃস্থানীয়া ; কিন্তু বাছা, এখেনে তোমার শালী শালাজ সম্পর্কে—এমন অনেকেও ত আছে ?"

"তাঁরাও আমার মা, আমি তাঁদের সন্তান। রমণী জগদম্বার অংশরূপিণী,—সুতরাং সকলেই আমার জননী। মা সকলেরা, অজ্ঞান সন্তানের

অপরাধ লইবেন না,—আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।”

সকলে স্তব্ধ, চমকিত, একটু ভীত। পরস্পর পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল।

তখন এক রঙ্গিণী আর এক রঙ্গিণীর প্রতি জনান্তিকে কহিল, “ও ভাই বেলফুল, ভালয় ভালয় সোরে পড়ি চল,—শেষ কি কোত্তে কি হবে ?”

“হাঁ, যে ভরসাটুকু ছিল, তাও ফুরুলো,—এবার খোলাখুলিই—একেবারে সকলকে মা বোলে ফেলেছে।”

কিন্তু আর এক ভামিনী আসিয়া তাঁহাদিগকে ভরসা দিয়া বলিল, “তা দেখনা, শেষ অবধি কি হয়। এ রকম ভিট্‌কিলুমীর অষুধও আমি জানি। মা বোলে—”

“দূর্ মুখপুড়ী! কি বলে দেখ ?—ও সম্বোধনের পর কি আর থাক্‌তে আছে ? আর একান্তই যদি থাক্‌তে হয়, ত আপনার আপনার ছেলে মেয়ের মুখ মনে কোরে থাকো।—না ভাই, আমি চল্লুম! আমার গা কেমন কাঁপ্‌চে,—সর্ব্বশরীর কি রকম কোচ্চে।”

একদল রমণী সরিয়া পড়িল। দেখাদেখি, আর একদলও—"ওমা, এমন তো দেখিনি,—এমন তো শুনিনে"—ইত্যাকার ভূমিকা ফাঁদিতে ফাঁদিতে চলিয়া গেল। বাকী রহিল দুটি জটিলা কুটিলা, আর সেই ভক্তিমতী সাত্ত্বিকপ্রকৃতি প্রবীণা।

ঘোষাল-গৃহিণী—রামরূপের শ্বাশুড়ীর যেন হরিষে বিষাদ হইল। মনে হইল,—"সত্যই কি জামাই উন্মাদপ্রকৃতি? না, ভিতরে আর কিছু আছে? হায়! শিবার কপালে, এ কি ঘটিল? বিপদভঞ্জন মধুসূদন! কে আমায় এ সংশয় ভঞ্জন করিয়া দিবে?"

চোখের জল চোখে মারিয়া তিনি জামাতার জলযোগের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

রামরূপ বলিলেন, "থাক্ মা, আহারের আমার কিছু বিলম্ব আছে,—আমি একবার ঠাকুর-ঘরে যাব। আপনার কন্যাকেও সেখানে একবার যেতে হবে। (ভক্তিমতী প্রবীণার প্রতি) মা, সকলে গেল, তুমি রইলে যে?"

গদগদকণ্ঠে প্রবীণা উত্তর দিলেন,—"বাবা, আমি তোমায় দেখ্‌চি।"

"আর তোমরা দুজন?"

সেই জটিলা-কুটিলা জাতীয় স্ত্রীলোক দুটির একটি —সেই কুটিলা বলিয়া উঠিল,—"ওগো সাধু পরমহংস মশাই! এখেনে থাক্‌তেও দোষ নাকি? আমরা তোমার চেলা হবো বোলে আছি।"

জটিলা বলিল, "মরণের দশা!—চেলা হোতে যাব কেন?—আমরা ওঁর লীলে-খেলা দেখ্‌তে রোয়েচি।"

কুটিলা। সে লীলে-খেলা কি তোমার আমার সাম্‌নে হবে?—সে যে গুপ্ত-লীলে!

সদাশিব রামরূপ দেখিলেন, এ দুই মূর্ত্তির হাত এড়ানো, সহজ নয়। ভাবিলেন, "তা ওদের যেটুকু আকাঙ্ক্ষা, পূরণ কোরে নিয়ে যাক্‌,—আমারো শাপে বর হোক।"

প্রকাশ্যে শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে পুনরায় কহিলেন, "মা, তোমার কন্যাকে একবার আমার সঙ্গে ঠাকুর ঘরে যেতে হবে। আর কেউ না যান। (ভক্তিমতী প্রবীণার প্রতি) রাত কত হোলো?

"এক-পর হোয়ে গেছে।"

রামরূপ ভাবিলেন,—"এই ত তবে সময়? মা

শঙ্করি! দেখো,—আমার মানসপূজায় না বিঘ্ন হয়।”

রামরূপ উঠিলেন। সেই পট্টবাস পরিধান, অঙ্গ—চন্দন-চর্চ্চিত, গলে বনফুলের মালা। সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন স্বর্গীয় পরিমল ও দিব্য জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে।

প্রবীণাকে আবার বলিলেন, “একটা অঙ্গহানি হোচ্চে। আমায় গোটাকতক রক্তজবা ও বিল্বপত্র আনিয়ে দিতে পার মা?—তোমার বাগানে আছে।”

প্রবীণা বিস্মিত হইলেন। তাঁহার বাগান আছে, সেখানে রক্ত-জবা বিল্বপত্র আছে,—ইনি কিরূপে জানিলেন? তাঁহাকে চিনিলেনই বা কিরূপে? কেউ ত কোন পরিচয় দেয় নাই?

জটিলা ভাবিল,—“এ আবার এক নূতন বুজ্‌রুকি।”

কুটিলা মনে করিল, “বাবুদের এই রাঙাগিন্নীর হাতে যে যোখের ধন আছে, ছোঁড়া কোন রকমে তার সন্ধান-সুলুক পেয়েছে দেখ্‌চি। পূজো-আচ্ছা ভড়ং দেখিয়ে, গিন্নির মন ভিজিয়ে, তা হাত

কোত্তে চায়।, উঃ! ছোঁড়াটা ত কম খেলোয়াড় নয়?”

ভক্তিমতী প্রবীণা, বিধবা, তিনি, নাম তাঁর অন্নপূর্ণা,—স্থানীয় জমিদার বাবুদের বাড়ীর বউ,—অপুত্রক,—কিন্তু দৌহিত্র সন্তান আছে,—অর্দ্ধেক সরিক তিনি,—ন্যূনকল্পে কোটীশ্বরী হইবেন! বস্তুতই কুটিলা তাহার কুটিল প্রকৃতিতে যে অনুমান করিয়াছিল, তাহার এই অংশ সত্য; কিন্তু বাকী অর্দ্ধাংশ, সে তার স্বভাবসিদ্ধ হিংসাবুদ্ধি বশেই সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছে;—সংসারানাসক্ত রামরূপ তাহার বিন্দুবাষ্পও জানেন না, কিংবা তাহা লাভ বা লোভের কল্পনাও করেন নাই।

বিস্মিতা অন্নপূর্ণা, তখনিই পরিচারিকাকে দিয়া, সাজি ভরিয়া, সদ্য-প্রস্ফুটিত রক্তজবা ও বিল্বদল আনাইয়া দিলেন।

সুঠাম ভঙ্গিতে রামরূপ সেই সাজিভরা ফুল-বিল্বপত্র গ্রহণ করিলেন। সস্মিত মুখে অন্নপূর্ণাকে কহিলেন, “মা, এখন তবে এস,—আবার দেখা হবে।”

ভক্তের ভগবান্,— ভক্তি-চুম্বকে বিধবার মনপ্রাণ

আকর্ষণ করিয়াছেন,—অনিচ্ছাসত্ত্বেও গৃহগমনে বাধ্য হইলেন। 'আবার দেখা হবে'—এই আশ্বাস বুকে ধরিয়া, মনে অনেক উচ্চ আশা ও সাধুচিন্তা লইয়া গেলেন। সারারাত বিনিদ্রনেত্রে তিনি এই জামাতা-রূপী নর-নারায়ণের মোহনরূপ ধ্যান করিলেন। শেষরাত্রে একটু তন্দ্রা আসিল, সেই তন্দ্রাবস্থায় তিনি স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণকে স্বপ্ন দেখিলেন। সে শ্রীকৃষ্ণ আর কেহ নন,—কনকবরণা ষোড়শী শিবাসুন্দরীর স্বামী—নবনীরদবরণ সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন—এই রাম-রূপ। রামরূপ যেন তাঁর শিয়রে আসিয়া বলিতেছেন,—"সাধ্বি! উঠ, দিন যায়, মার পূজা করো। সহরের সন্নিকটে মা-গঙ্গার তীরে, প্রশস্ত দেবালয় ও অতিথিশালা নির্ম্মাণ করো;—তোমার মঙ্গল হইবে। তোমার রক্তজবা ও বিল্বদলে মা প্রসন্না হইয়াছেন। এই লও—মায়ের সেই নির্ম্মাল্য।"—আশ্চর্য্য! স্বপ্নভঙ্গ ও তন্দ্রা অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে—বিধবা মস্তক-উপাদানে মায়ের সেই প্রসাদী ফুল-বিল্বপত্র পাইলেন।

এদিকে ভক্তাবতার রামরূপ সেই সাজিভরা ফুল-বিল্বপত্র লইয়া, ঠাকুরঘরে যাইতে উঠিলেন।

তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী সে গৃহে আলোকাদি দিয়া আসিলে বলিলেন, "আপনার কন্যা ব্যতীত ওখানে যেন আর কেহ না যান।"

"তাহাই হইবে বাপ—তোমার যা সাধ যায় করো, কিন্তু দেখো বাবা, শিবা আমার যেন অসুখী না হয়।"

"সে বরাতের কথা মা।"

"হাঁ, একটা কথা,—ঠাকুরের ঐ রকে একটি সন্ন্যাসিনী শুয়ে আছেন, তাতে কোন আপত্তি হবে কি বাপ ?"

"না মা, ওরূপ মাতৃরূপিণী সন্ন্যাসিনী আমার মাথার মণি, উনি যেমন আছেন থাকুন, আর যেন কেউ না যান।"

কন্যা শিবাসুন্দরী একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, মাতা গিয়া তাঁহাকে স্নেহভরে, জামাতার অগোচরে বলিলেন, "মা, তুমি গিয়া ওখানে থাকো, কখন্ কি চান। যাও মা, যাও, রঘুনাথজীর কাছে হত্যা দে পোড়ে থাকো,—তিনিই যদি মুখ তুলে চান।"

শিবাসুন্দরী আর মুখে কোন উত্তর করিলেন না, মনে মনে কহিলেন, "মা আমার!" মায়াবশে

যাঁকে পাগল জামাতা বোলে ভয় পাচ্চ, উনি সহজ পাগল নন,—পাগলপতি স্বয়ং দেবদেব উনি;—প্রচ্ছন্নরূপে আজ তোমার গৃহে অতিথি হইয়াছেন।”

ষোড়শী মাতা শিবাও পট্টবাসভূষিতা হইলেন। ধীরপাদবিক্ষেপে নিজেই পূজাগৃহে যাইতে লাগিলেন। সঙ্গিনী সহচরীরা তখন আর কেহই ছিল না,—একাকী আপনা হইতেই মাতৃআজ্ঞা ও স্বামীর আদেশ পালন করিতে চলিলেন।

জটিলা-কুটিলার কৌতূহল আরো বাড়িল। তাহারা চলিয়া যাইবার ভাণ করিয়াও, চোরের মত ওৎ পাতিয়া বাটীর একস্থানে লুকাইয়া রহিল।

প্রাঙ্গণে পা দিয়াই সাধ্বী শিবাসুন্দরী—সেই পবিত্রশ্রী, বিশুদ্ধাত্মা যোগিনীকে দেখিতে পাইলেন। যোগিনী তখন সেই দেবগৃহের বহির্দ্দেশে বসিয়া—ধ্যাননিমীলিত-নেত্রা হইয়া আছেন।

সঙ্গে স্বয়ং ভক্তাবতারও আসিলেন। দেখিলেন এবং বুঝিলেন, তাঁহার সেই আদিভক্ত—অথবা সেই মূর্ত্তিমতী ভক্তি—তাঁহারই ধ্যানে বিভোরা।—সাগরের জল সাগরেই আসিয়া মিশিয়াছে।

অন্তর্য্যামী সকলই অবগত, তাই হাসি হাসি মুখে ভক্তের নাম ধরিয়া ডাকিলেন,—"সরমা!"

যোগিনী চমকিতা হইয়া দেখিলেন, সম্মুখে তাঁহার ইষ্টদেবতা—নবীন নীরদবরণ সেই রাম-রূপ। কিন্তু রামসীতার যুগলরূপ ত কৈ, এখনো একাধারে দেখা হইল না? শিবাসতী তখন পূজাগৃহে;—কাজেই ভক্ত যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন।

অন্তর্যামী, ভক্তের অন্তর বুঝিলেন। স্নেহমাখা-স্বরে পুনরায় কহিলেন, "সরমা, ক্ষুণ্ণ হইও না। তুমি যাহা দেখিতে চাহিতেছ—ঐ দেখ।—ঘরে ঐ কে বলো দেখি?"

"অষ্টধাতুনির্ম্মিত তোমার বিগ্রহ। কিন্তু আর আমি ঐ ধাতুময়ী মূর্ত্তি দেখিতে চাহি না,—আমি রামসীতার প্রত্যক্ষ যুগলরূপদর্শনে অভিলাষিণী। দয়াময়! আমার এ বাসনা কি পূরিবে না?"

"ভক্তের বাসনা কবে অপূর্ণ থাকে সরমা?"

"মাও তাহা আভাসে বলিয়াছেন বটে; কিন্তু বিলম্ব হইতেছে কেন ঠাকুর?—প্রতি পল যে যুগ বলিয়া মনে হয়!"

শিবাসুন্দরী বিস্মিতা হইয়া ভাবিলেন, "তবে

সত্যই সেই অশোক বনের সরমা—এ যোগিনী মূর্ত্তিতে আসীনা! কিন্তু হায় সীতা,—জন্মদুঃখিনী সীতা! ওঃ! চিরদুঃখেই এ জীবন গোঁয়াইতে হইবে।"

যোগিনী পুনরায় একটু অধীরভাবে, অপেক্ষাকৃত একটু উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "জানকীবল্লভ' আরোও কি বিরহভোগ করাইবেন সাধ?"

সেই গৃহের দেওয়াল হইতে কিছু দূরে—একটা গাছের আড়ালে অবস্থিতা—লুক্কায়িতা জটিলা—কুটিলাকে চুপি চুপি বলিল, "বলি, আর কেন? যা জানতে সাধ ছিল, জানলে ত? চল, এইবার সোরে পড়ি।—মশার কামড় আর সইতে পারি না।"

কুটিলা। (সেইরূপ চুপি চুপি) আরো একটু রঙ্গ দেখে যাই চল,—ছোঁড়া কি উত্তর দেয় শুনি।

জটিলা। উত্তর আর দেবে কি? দুজনেই মোজেছে। দেখ্‌চিস্ না, কেমন গলায় গলায় ভাব!

বলা বাহুল্য, পাপিষ্ঠাদের কর্ণে শেষের কথাটি মাত্র প্রবেশ করিয়াছিল। যেমন মন, সেইরূপই ঘটে!—হতভাগীরা একটু আগাইয়া আসিল।

উত্তরে নির্ব্বিকার মহাপুরুষ, যোগিনীকে বলি-

লেন, “বিরহই ভাল সরমেশ! কৃষ্ণপ্রেমে গোপিকাদের সে বিরহোন্মাদ মনে আছে তো? মিলনে বাঞ্ছিতকে একস্থানে পাওয়া যায়, কিন্তু বিরহে, সর্ব্বভূতে তাঁহার বিরাট্ সত্ত্বা উপলব্ধি হয়। যাই হোক, তোমার সাধ আর একটু পরেই পূরিবে,—আমি পূজাগৃহ হইতে আসি।”

জটিলা আর থাকিতে পারিল না,—হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। সেইরূপ হাসিতে হাসিতে পাপিষ্ঠা বলিল, “তা আর একটু পরে কেন, এখনি সাধ পূরাও না গো গোঁসাই! ‘মাথার মণি’ তোমার—আর কতক্ষণ ধৈর্য্য ধরে রবেন?”

কুটিলা আরো একটু ঘোরালো করিয়া হেঁয়ালি ছন্দে বলিল,—

“তনু মন জর জর বিরহের বাণে।
এস বঁধু বুকে ধরি ও বিধু বয়ানে॥

—পরমহঁাস মশাই! প্রণাম হই,—এখন দেশে দেশে, নগরে নগরে গিয়ে তোমার গুণগান করি।”

নির্ব্বিকার মহাপুরুষ ঈষদ্ হাস্যে উত্তর দিলেন,—“এই যে, আছ তোমরা?—তাইত বলি!”

কুটিলা তখন রঙ্গে ভঙ্গে উত্তর দিল,—

"বলি বলি বোল্‌বে কত, কত সাধ আছে।
আশ্ মিটিয়ে বোলো তোমার ভৈরবীর কাছে॥
তাই ত বলি এত কেন—মা মা বোলে ডাকা।
'অতিভক্তি চোরের লক্ষণ' রইল না আর ঢাকা॥"

করুণাসাগর কৃপাময় মনে মনে বলিলেন, "আহা কৃষ্ণের জীব! এই করিয়াও যদি সুখী হইতে পারো!"

জটিলা কুটিলাকে বলিল, "নে বাপু তোর ছড়া-কাটা! আসর রাখা হোল,—বাসর জাগা হোল, এখন রাত হোয়েছে, বাড়ী যাই চ।—গোঁসাইঠাকুর, তবে পের্‌নাম হই।"

কুটিলা যাইতে যাইতে বলিল; "এমনেও রাত হোয়েছে—অমনেও রাত হোয়েছে,—কচিছেলে নীলুকে এ সুখের সংবাদটা না দিয়ে কি বাড়ী যেতে পারি? আহা, ছেলেমানুষ একবার অন্দরে ঢুকেছেল বোলে, ও বাড়ীর ঐ কর্কশা ঠাক্‌রণ তাকে কি মুখনাড়াটাই না দিলে!"

তখন কুটিলা জটিলা জোট্ বাঁধিয়া, সেই 'কচিছেলে' নীলমণিকে খুব খোরালো করিয়া ঐ সুখের সংবাদটা দিয়া গেল। সে বানর তাই না

শুনিয়া, তাহার দলস্থ আর সকল বানরকে একত্র করিয়া,—বিশেষ যে পয়লা নম্বরের বানরটা তাহাকে সর্ব্বাগ্রে ভৈরবীর সংবাদ দিয়া তাহাকে 'কর্কশা-ঠাক্‌রণের' মুখনাড়া খাওয়াইয়া ছিল,—সেইটেকে সকলের মোড়ল করিয়া, সেই রাত্রেই সেই মিঠা-পুকুর গ্রাম তোলপাড় করিতে লাগিল। কিচির-মিচির করিয়া, লোকের গাছের ডালপালা ভাঙ্গিয়া, এবং না বলিয়া ফল পাকুড় খাইয়া—সর্ব্বত্রই তারা কুটিলা-কথিত খোস খবরটি প্রচার করিয়া দিল। বলা বাহুল্য, তাহাদের সমধর্ম্মা বানরবানরীরা, এ সংবাদ শুনিবামাত্রই বিশ্বাস করিল,—উদ্দেশে সেই পুণ্যাত্মাদের সম্বন্ধে কত কুক্রিয়া কল্পনা করিয়া লইল;—আর যাদের একটু বোধ শোধ আছে, কি সেই ভক্তিমতী যোগিনী বা সাক্ষাৎ সেই নরোত্তম রামরূপকে একবার চোখে দেখিয়াছে, তারা এ কুৎসাপূর্ণ সংবাদ শুনিবামাত্র—দূর্ দূর্ করিয়া বানরদের তাড়া করিল, কেহ বা তাহা উপেক্ষাভরে হাসিয়া উড়াইয়া দিল।

তখন সেই কুটিলা ও 'কচিছেলেয়'—জনান্তিকে কি একটু চোখ ঠারাঠারি হইয়া গেল। কুটিলা

ভাবিল,—"সেই ভাল, এ কু-পল্লী ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।—পোড়া লোকে নানা কথা তুলিবে।"

'কচিছেলে' মনে মনে বলিল, "আহা! কদম-দিদি আমার ব্যথার ব্যথী!—অমন গুণমণিকে সুখী করিতেই হইবে।"

এ দিকে যোগিনী দেখিলেন, তাঁহার আজীবন তপস্যার ফলপ্রাপ্তির সম-সমকালে,—জীবনের এই সিদ্ধিপথে—এক মহাবিঘ্ন ঘটিল। ভাবিলেন, "হায় হায়! এ কি হইল? একবার—নিমেষের তরেও একবার মাত্র—আমার ইষ্টদেবতার যুগলরূপ দেখিয়া যদি এ কলঙ্ক রটিত!—না, কলঙ্কও তুচ্ছ,—এ জীবন বিনিময়েও যদি মনসাধ মিটাইতে পারিতাম?—হায় ভাগ্য! কিন্তু হে জনার্দ্দন! এ ত তোমারই ছলনা নয়?'"

অন্তর্য্যামী পুরুষোত্তম হাসি-হাসিমুখে কহিলেন, "কি সরমা, আমিই সাধ করিয়া এ কলঙ্ক রটাইলাম মনে করিতেছ—না? কিন্তু আমি ত তখনিই তোমায় বলিয়া রাখিয়াছি,—এ সব কার্য্যের এই বিধি! দুর্ম্মুখের দুঃশীলতা কিংবা জটিলা কুটিলার বক্রতা না থাকিলে, সংসারে সত্যের মহিমা প্রকাশ হয়

কিরূপে ? এখন ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমার আমার পথ কত নিষ্কণ্টক হইয়া গেল।—চরিত্র-হীন ভণ্ড ভাবিয়া সহসা কেহ, আমাদের কাছে ঘেঁসিবে না।"

"কিন্তু প্রভু, আমার প্রাণের পিপাসা মিটিল কৈ ? —মা ত কৃপা করিয়াও করিলেন না ?"

"সত্যই কি তোমার প্রাণের পিপাসা ? তবে তৃষ্ণার জল লও। একবার সম্মুখে চাহিয়া দেখ দেখি ?"—স্বয়ং মাতা শিবাসুন্দরী অতি অপূর্ব্ব কোমলস্বরে এই কথা বলিলেন।

"মা, মা, তুমি ?—তুমি আশ্বাস দিলে ? হাঁ, দেখিতেছি,—এই দিব্য জ্যোৎস্নালোকে দেখিতেছি,—অতি সুন্দর,—অতি মধুর,—অতি পবিত্র মা তুমি ! কিন্তু মা, এ যে তোমার ছায়াময়ী মূর্ত্তি !—আমি স্পর্শ করিতে পারি কৈ ? যদি দয়া করিলে, তবে আর কৃপণতা কর কেন জননি !—একবার এমনিভাবে শরীরিণী হইয়া বাবার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াও !—একি, বাবা ! তুমিও আর এখানে নাই ? তুমিও ঐ বিমানদেশে ? তবে—তবে রাম, রঘু-কুলপতি, আমার চিরজন্মের ইষ্টদেবতা !—এই

কলঙ্কের পসারা মাথায় লইয়া আমি মরি ? তবে তাই ;—সেই দীঘীতে ঢের জল আছে।—তোমার নাম করিতে করিতে আমি মরি !”—মর্ম্মান্তিক দুঃখ-অভিমানে যোগিনী—প্রস্থানোদ্যতা হইলেন।

চকিতে ভক্তপ্রাণ সচ্চিদানন্দ শ্রীহরি আসিয়া—ভক্তের হাত ধরিলেন। অমৃতমাখা কণ্ঠে বলিলেন, “ছি! এমন কাজ করিতে নাই, আত্মহত্যায় কাহারো অধিকার নাই;—চিত্ত স্থির কর। এইবার তবে তুমি আমায়—তোমার বাঞ্ছিত রূপে দেখ। কিন্তু একটি অনুরোধ,—এ দেহে, চর্ম্মচক্ষে, আর এ অনুরোধ করিও না। এই প্রথম ও এই শেষ। কেন বা কি জন্য, তুমি নিজেই তাহা বুঝিতে পারিবে। এবার আমার দায়িত্ব বড় কঠিন ও গুরুতর। পবিত্র মাতৃভাবে আমায় সকাম ও নিষ্কাম দুই সাধনার আদর্শই দেখাইয়া যাইতে হইবে। কেননা প্রধানতঃ গৃহার জন্যই আমার এ নরলীলা। তবে দেখ, গৃহমধ্যে এস,—ঐ উজ্জ্বল দীপালোকে দৃষ্টিপাত কর!”

লীলাময় রামরূপ, ইচ্ছামাত্রেই পূর্ণব্রহ্ম রাম-রূপ ধারণ করিয়া,যোড়শী মাতা শিবাসুন্দরীর দক্ষিণ

পার্শ্বে গিয়া, দাঁড়াইলেন। আশ্চর্য্য!—মাতাও তন্মুহূর্ত্তে জনক-নন্দিনীর ভুবনমোহন রূপে দিক আলো করিলেন। স্মিতমুখে ঠাকুর বলিলেন,—"এখন বলো দেখি, আমাদের দুয়ের মধ্যে সুন্দর কে?"

যোগিনী কোন উত্তর দিলেন না, কথা কহিবার সামর্থ্যই তাঁহার ছিল না।—নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে, স্থিরনেত্রে, তিনি রামসীতার এই অপরূপ যুগলরূপ —এ ভুবনমোহিনীমূর্ত্তি, প্রাণ ভরিয়া দেখিলেন। দেখিলেন এবং তৎসঙ্গে উভয়ের সেই ব্রহ্মাদির দুর্লভ অমৃতময় পাদপদ্ম—বক্ষেঃ ধারণ করিলেন। বুক চিরজন্মের মত জুড়াইল,—প্রাণের পিপাসা চির-নিবৃত্ত হইল। তাঁহার মুখে আর কথা নাই,—বাক্‌শক্তি যেন চিরবিলুপ্ত হইয়াছে।

ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ জগন্মাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! ইহজন্মে এরূপ ভাবে আমাদের পরস্পরের এই দৈহিক স্পর্শন,—এই প্রথম ও এই শেষ। ভক্তের জন্য এরূপ ভাবে আমি তোমার অঙ্গস্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়াছি জানিও। এই জন্য আট বৎসর কাল তোমায় ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে উপদেশ দিয়াছিলাম। নিজেও

তাহা বিবিধ উপায়ে সাধন করিয়াছি। দেখিয়া সুখী হইলাম, তুমি সে মহাব্রত রক্ষা করিয়া আসিয়াছ। এখন তোমার এই অপরূপা ষোড়শী মাতৃমূর্ত্তি তপের যোগ্যই হইয়াছে।—আজ হইতে আমি তোমাকেই তপ করিব।"

"আমার নারীজন্ম সার্থক,—শিবশক্তিতেই আমি শক্তিরূপা হইলাম।"

"কিন্তু সতি! ইহজন্মে আমাদের দাম্পত্য-আলাপের এই প্রথম ও এই শেষ। আমার ও তোমার মাতৃদেবীকে, যতদূর সম্ভব, ইহা বুঝাইয়া বলিও;—নচেৎ তাঁহারা মনোদুঃখ পাইবেন।"

জগন্মাতা বলিলেন, "জীবনবল্লভ! দৈহিক সম্বন্ধ দুই দিনের জন্য বৈ ত নয়? আমিও তাহা চাহি না। তবে প্রাণে প্রাণে—আত্মায় আত্মায় তোমার সহিত আমার যে নিত্য-সম্বন্ধ, তাহা যেন অবিচ্ছিন্নভাবে অনন্তকাল ধরিয়া থাকে।"

"তাহা থাকিবে সতি! নহিলে জগৎ মিথ্যা।"

মাতা ভূমিষ্ঠা হইয়া, জগদ্‌গুরু ত্রিলোকস্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিলেন; ভক্তবৎসল ভগবান্ ঈষৎ হাসিয়া তাঁহার মস্তকে পদ্মহস্ত অর্পণ করি-

লেন। সহসা সে রূপ রূপান্তরিত হইল। উভয়ে স্বাভাবিক মনুষ্যাকারে রামরূপ ও শিবাসুন্দরী-রূপে পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইলেন।

রামরূপ বলিলেন, "হাঁ, এইবার তোমার গৃহাশ্রমে অধিকার। চল সতি, আমার প্রত্যক্ষ পরমেশ্বরী আমার মাতৃদেবীর পদসেবা করিতে চল। নহিলে তাঁর উষ্ণশ্বাসে আমার যোগ-তপঃ-ইষ্ট-আরাধনা সকলি ভস্মীভূত হইবে।"

শিবা। দেব-আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।

সরমা তখনও নীরব। জন্মজন্মান্তরীণ সুকৃতি-ফলে, একদৃষ্টে সেই অলৌকিক দেবলীলা নিরীক্ষণ করিতেছেন।

রামরূপ একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন; সহধর্ম্মিণীকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "আজ শনিবার, মার পূজার প্রশস্ত দিন। তোমাকে আমার 'মা' হইতে হইবে। আজ হইতে তোমায় আমি এই পবিত্র সম্বোধন করিলাম। দেবি! আজ আমি মাতৃপদে —তোমার চরণ-সরোজে পুষ্পাঞ্জলি দিব। তবে লও মা, ভক্ত সন্তানের মানস-অর্ঘ্য!—আমি তোমায় বন্দনা করিয়া ধন্য হই।—জয় মা কালী, করালী,

মহাশক্তি! বুকে বল দাও। আমার মানসঘটে যে ভাবে আছ, সেই ভাবেই থাকো। তোমারই প্রদত্ত মাতৃমন্ত্রে,—তোমার ঐ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ মহামন্ত্রে, যেন মা আমার 'কামিনীকাঞ্চন' জয় চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে।"

ভক্তাবতার—শ্রীভগবান্ তখন ভক্তিগদগদকণ্ঠে শ্রীমুখে এই স্তব ধরিলেন,—

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব,
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা চ গুরুস্ত্বমেব,
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব-দেবি!"

স্তব অন্তে সেই সদ্য-উত্তোলিত রক্তজবা ও বিল্বদল তিনি মন্ত্রঃপূত করিলেন। পরে সেই মন্ত্রঃ-পূত পুষ্পপত্র লইয়া যথাবিধি মাতৃপদে অঞ্জলি দিলেন। গঙ্গাজলে ও বিল্বদলে মা সম্পূজিতা হইলেন।

পূজা অন্তে যথারীতি আরতিও হইল। সে আরতিও অদ্ভুত। যথারীতি পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়া, শঙ্খঘণ্টা সহযোগে, বহুক্ষণ সে আরতি চলিল।

পরে মাতৃপূজার সেই নির্ম্মাল্য মার হাতে দিয়া

মহাপুরুষ কহিলেন, "সখি! এই লও, মাতৃপূজার এই পবিত্র মন্ত্রঃপূত পুষ্পবিল্বদল। তুমি যা মনে করিয়া—যাকে ইহা দিবে, সিদ্ধ হইবে। আর এই লও আমার মাতৃপূজার দক্ষিণা। আমার মাতৃনাম-সিদ্ধ এই জপের মালা ও সিদ্ধির ঝুলি, ইহাও তুমি যদৃচ্ছা ব্যবহার করিও। মা! তোমায় এই সাধকভাবে দর্শন ও স্পর্শন, ইহলীলায় এই শেষ। আশা করি, তুমিও আমায় ঠিক এই ভাবে দেখিবে। পার যদি, একেবারেই দেখা দিও না। কি জানি, রক্তমাংসের শরীর এ নরদেহ। স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রেরও মোহ আসিয়াছিল,—তাই বড় ভয়। আর যদি দেখা দিতেই হয়, এই আজিকার দিন স্মরণ করিয়া, তোমার এই মহাশক্তিমূর্ত্তিতে—সাক্ষাৎ মাতৃরূপে দেখা দিও ;—শতমদনও ভস্মীভূত হইতে পারিবে।"

"তাহাই হইবে। আমিও জন্ম জন্ম হে শিব! হে জগদ্‌গুরু! তোমার এই পবিত্র পাদপদ্ম অন্তরে ধ্যান করিয়া, আমার এ নারীজন্ম সার্থক করিব। একটি অনুরোধ, কেবল এই কন্যাটিকে আমার কাছে রাখিও।—সরমাকে আমায় দাও।"

"সরমা চিরদিনই তোমার। তবে এ জন্মে আমায় চাহিয়া আসিয়াছে, তাই ছায়ার ন্যায় চিরদিন আমার সহচারিণী হইয়া থাকিতে চায়। 'লজ্জা—মান—ভয়'—তিনেই জলাঞ্জলি দিয়া, বড় আশায় ভক্ত আমায় চাহিয়াছিল, তাহার সাধ মিটিয়াছে,—ইহাতেই আমি কৃতার্থ।—এখন সরমাই বলুক, সে কার কাছে থাকিতে চায়।"

সরমা এতক্ষণ নির্ব্বাক্, নিস্তব্ধ, নিশ্চল হইয়া, সম্পূর্ণরূপে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া আপন আত্মাতেই অবস্থিত ছিল; ইষ্টদেবতার ইচ্ছায় এখন তাহার সে যোগ ভাঙ্গিয়া গেল; কিন্তু দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া সে দেখিল, বড় সুন্দর কৌতুক হইতেছে। যেন দর্পণে প্রতিবিম্ব দর্শনের ন্যায়—একাত্ম প্রকৃতি পুরুষে দ্বন্দ্ব লাগিয়া গিয়াছে। তাই সে হাসি হাসি মুখে কহিল,—"এখন তোমরা দুই-ই আমার সমান;—আমি উভয়ের কাছেই থাকিব,—অথবা উভয়েই—আমার হৃদয়ে থাকিবে।"

রামরূপ। বটে সরমা?

শিবা। বটে সই?

সরমা দেখিল, এ সোনার স্বপ্ন অধিকক্ষণ নয়,—

এখনি ভঙ্গ হইবে। তাই সহজভাবে বলিল, "আমি দু'জনের কাছেই থাকিব; দুজনকেই চোখে চোখে দেখিব,—তাহার পথও হইয়াছে। হে ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু রাম! তুমিই নিজগুণে সে পথ করিয়া দিলে!"

সরমা ভক্তিভরে উভয়ের পদধূলি গ্রহণ করিল। উভয়ের চরণ-পাদোদক লইয়া অমৃতজ্ঞানে পান করিল। সে অমরী হইল। তাহার ভব-ক্ষুধা চিরদিনের জন্য দূর হইল। তাহার জন্মমরণ-জ্বালা একেবারে জুড়াইল।—ভক্তির জয় হইল।

ইতি প্রথম খণ্ড।

দ্বিতীয় খণ্ড।

লীলা ও আকর্ষণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:o✱o:—

"কি সুখ জীবনে মম,
ওহে নাথ দয়াময় হে!
যদি চরণ-সরোজে,
পরাণ-মধুপ,
চিরমগন না রয় হে॥"

সহরের সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্রপল্লীর ক্ষুদ্র এক পথ দিয়া, এক সন্ন্যাসিনী মনের আনন্দে এই গান গাহিয়া যাইতেছিলেন। তিনি গান গাহিতেছেন, আর তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রুপাত হইতেছে। নিকটে একটি দেবালয় ছিল; সেই দেবালয়ের মুক্তপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া, ভক্তিমতী সন্ন্যাসিনী আপন মনে গাহিতে লাগিলেন,—

"সুকুমার কুমার-মুখ দেখিতে না চাহি হে।
যদি সে চাঁদ-বয়ানে, তব প্রেম-মুখ, দেখিতে না পাই হে ॥
কি ছার শশাঙ্ক-জ্যোতি, দেখি আঁধারময় হে।
যদি সে চাঁদ প্রকাশে, তব প্রেম-চাঁদ,নাহি হয় উদয় হে ॥
সতীর পবিত্র প্রেম, তাও মলিনতাময় হে।
যদি সে প্রেম-কনকে, তব প্রেম-মণি,নাহি জড়িত রয় হে ॥
তীক্ষ্ণবিষ ব্যালি সম সতত দংশয় হে।
যদি মোহ পরমাদে নাথ, তোমাতে ঘটায়, সংশয় হে ॥
কি আর বলিব নাথ, বলিব তোমায় হে।
তুমি আমার হৃদয়-রতনমণি, আনন্দ-নিলয় হে ॥"

ভক্তিরসপূর্ণ এই গান শুনিয়া, সাক্ষাৎ ভক্তিরূপিণী এই গায়িকা সন্ন্যাসিনীকে দেখিয়া, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে দেবালয়-স্বামী সেই দেবমন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলেন। অনন্ত রূপময় দিব্য শ্যামসুন্দরের বিগ্রহমূর্ত্তি সে মন্দিরে বিরাজিত। প্রেমের অবতার রাধাশ্যাম মনোহর ভঙ্গিতে মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। রাধা,—প্রেমে বিহ্বলা, অনিমেষ নয়না, আনন্দে নৃত্যময়া; শ্যামও সেই নৃত্যে নৃত্যময় হইয়া—প্রেমের মুরলী মোহন করে লইয়া, ত্রিভঙ্গ ঠামে শ্রীমুখে অনন্ত-প্রেমের আলাপ করিতেছেন। ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে,

অনিমেষ নয়নে, ভক্তিপ্রাণা সন্ন্যাসিনী—প্রেমের এই স্বর্গীয় খেলা দেখিলেন। প্রাণ পুলকে পূর্ণ হইল, হৃদয় ভক্তিতে ভরিয়া উঠিল,—তগদতচিত্তে, সুনির্ম্মল শুদ্ধ অন্তরে তিনি রাধাশ্যামকে প্রণাম করিলেন। আবার ঐ গান গাহিলেন।—সংসারী জীবের গতিমুক্তির জন্য কি সন্ন্যাসিনী পথে পথে এই গান গাহিয়া বেড়াইতেছেন ?

"বলো,—জয় শ্রীরামকৃষ্ণ।"

সহসা কে এক সরল সাধুবেশধারী,—দিব্য আনন্দময় পুরুষ—সেইখানে আসিয়া, দিব্য হাসি-হাসি মুখে কহিলেন, "বল—'জয় শ্রীরামকৃষ্ণ'। সেই পুরুষোত্তম রামকৃষ্ণ—সেই দয়াময়—করুণার সাগর রামকৃষ্ণ—আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল গৃহীর পারের কর্ত্তা।—জয় শ্রীরামকৃষ্ণ।"

সন্ন্যাসিনী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "না, জয় শ্রীরামরূপ।"

আগন্তুক। মা, রামরূপকে কি তুমি দেখেছ ?

সন্ন্যাসিনী অতি দীনভাবে মুখ অবনত করিয়া কহিলেন, "কি আর বলিব ?—আপনি কি ভগবান্ রামকৃষ্ণকে দেখেছেন ?"

আগন্তুক। না মা, সে বিশ্বরূপ দর্শনের সৌভাগ্য এখন অবধিও আমার হয় নাই। ধ্যানে তিনি আমায় দেখা দিয়াছেন মাত্র। একাধারে রামকৃষ্ণ-রূপে দেখা দিয়াছেন। তবে শিশুরূপী এক নারায়ণের মুখে শুনেছি, তিনি সশরীরে, সহরের সন্নিকট—গঙ্গার ধারে—এক কালী-বাড়ীতে আছেন। অন্নপূর্ণার কালী বাড়ী;—দশ বৎসর ধোরে, লাখ্ লাখ্ টাকা ব্যয় কোরে, যা নির্ম্মাণ হোলো।—মার পূজকরূপে,—নিরক্ষণ দীন ব্রাহ্মণ-বেশে,—তিনি ঐখানে থাকেন।—হা প্রভু লীলাময় শ্রীগৌরাঙ্গদেব! তুমি কখন কি রূপ ধরো!

বলিতে বলিতে আগন্তুকের দুই চক্ষু বাহিয়া অবিরলধারে প্রেমাশ্রুপাত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসিনী দেখিলেন—"এ জীব সামান্য নয়, ভগবৎপ্রেমে ইহাঁর প্রাণ পূর্ণ। প্রেমের অবতার—দয়াল ঠাকুর—ইহাঁকে আকর্ষণ করিয়াছেন। একাধারে রামকৃষ্ণ-রূপে দেখা দিয়াছেন। তা না দিবেন কেন? অনন্ত রূপ, অনন্ত বিভূতি তাঁর; ইচ্ছাময় তিনি; তাই আমার যিনি রাম-রূপ, তিনিই ইহাঁর রামকৃষ্ণ। মহা-ভাগ্যবান্ পুরুষ ইনি;—ইহাঁকে প্রণাম করি।"

সভক্তি কৃতজ্ঞ অন্তরে সন্ন্যাসিনী— আগন্তুককে প্রণাম করিলেন।

আগন্তুক অতি ত্রস্তভাবে পশ্চাতে হটিয়া আসিয়া বলিলেন, "মা, ও কর কি, কর কি? দেখিতেছি, তুমি সেই পুরুষোত্তম মহাপ্রভুর প্রসাদ-লাভে সৌভাগ্যশালিনী—সর্ব্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী; আর আমি একজন সামান্য গৃহী; কাম-কাঞ্চনের দাস;—দারাপুত্র লইয়া সংসার করি।—সন্তানের অকল্যাণ কোরো না জননি!"

সন্ন্যাসিনী। দারাপুত্র লইয়া সংসার করিলেই লোক অপবিত্র হয় না, বরং ধন্য হয়,—যদি ভগবানের প্রসন্নতা সে লাভ করে। বাবা, তুমি যেই হও, আমার নমস্য। ভক্তবৎসলের আশীর্ব্বাদ তুমি পাইয়াছ; তিনি তোমায় টানিয়াছেন; তোমা দ্বারা জীবের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে মনে হইতেছে; —তুমি ত সামান্য নও? ভক্তের সর্ব্ববিধ সুলক্ষণ তোমার শ্রীঅঙ্গে।—তোমার নাম কি বাপ?

আগন্তুক। (ঈষৎ হাসিয়া) তায় খুব,—দেবেন্দ্রবিজয় গোস্বামী। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। তাল-পুকুরের নাম আছে মাত্র; কিন্তু সে তালগাছও

নাই, আর সে পুকুরও নাই,—আছে একটি এঁদো ডোবা।—গোস্বামীবংশে জন্মিয়াছি বলিয়াই ত আর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু তাঁর রাতুল চরণ এ দীনকে দিবেন না?—হায়! সে ভক্তি কৈ? সে প্রেম কৈ? সে জ্বলন্ত বিশ্বাস কৈ মা? তাই জুয়ারের জলের মত—একবার এ ধর্ম্মে—একবার সে ধর্ম্মে ভাসিয়া বেড়াইতেছি। কিন্তু জানি না, যেন কে বলিয়া দিল, 'এইবার তোর গতি হইবে।' মা, হবে কি?

সন্ন্যাসিনী। নিশ্চয়—ঐ শ্রীমুখের শুভ লক্ষণেই তা প্রকাশ। আমিও ভগবানের মুখে ইহা শুনেছি।

গোস্বামী। তবে চল মা যাই,—সেই পতিতপাবনের চরণতীর্থে। আহা! এত দয়া তাঁর? এমনি ভাবে তিনি জীবকে আকর্ষণ করেন? বুঝ্‌লেম, এ ঘোর কলির তিনিই প্রচ্ছন্ন কর্ণধার,—তাঁর ধ্যানেই মুক্তি।

সন্ন্যাসিনী। আমার চক্ষে কিন্তু তিনি রাম-রূপ।

গোস্বামী। তাতে কিছু আসে যায় না মা!—

"যেই রাম, সেই কৃষ্ণ, দুয়ে মিলে রামকৃষ্ণ!"

কথাটা বলিয়াই বিস্মিতভাবে মনে মনে

কহিলেন, "একি! সহসা আমার একি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হোলো? কৈ, এ মহাভাবে একদিনও ত হৃদয় পূর্ণ হয় নি? বুঝ্‌লেম, তাঁরই দয়া, তাঁরই ইচ্ছা;—সময়গুণে তিনিই গণ্ডী কেটে দিলেন। আহা! অহেতুক কৃপাসিন্ধু তিনি।—ভাবরূপী জনার্দ্দন, ভগবন্!"

গদগদকণ্ঠে, প্রেমাশ্রুপূর্ণ নেত্রে তিনি কহিলেন, "চল মা, হরিনাম কোত্তে কোত্তে যাই।"

এই বলিয়া "হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল, রবে তিনবার হাতে তালি দিয়া, ভাববিভোরকণ্ঠে তিনি গাহিলেন,—

"(আমার) কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।
ব'লতে হরিনাম, শুনতে গুণগ্রাম,
অবিরাম নেত্রে ব'বে অশ্রুধার॥
(ক'বে) সুরসে রসিক হইবে রসনা,
জাগিতে ঘুমাতে ঘোষিবে ঘোষণা,
যুগল-মন্ত্রে কবে হবে উপাসনা,
বিষয় বাসনা ঘুচিবে আমার।
কতদিনে হবে সর্ব্বজীবে দয়া,
কতদিনে যাবে গর্ব্ব মোহমায়া.

কতদিনে হবে খর্ব্ব মম কায়া,
নত হব হায়! লতা যে প্রকার॥
কতদিনে হবে জ্ঞানোদয় মম,
কতদিনে যাবে ক্রোধ কাম তমঃ,
কতদিনে হব তৃণাদির সম,
রজেতে লুণ্ঠিত হব অনিবার॥
কবে যাবে জাতি কুলেরই ভরম,
কবে যাবে আমার ভরম সরম,
কবে যাবে আমার ধরম করম,
কতদিনে যাবে এই লোকাচার।
কবে পরেশমণি কর্‌ব পরশন,
লৌহ-দেহ আমার হইবে কাঞ্চন,
কতদিনে হবে কষ্ট বিমোচন,
জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার॥
কতদিনে ব্রজের প্রতি কুলি কুলি,
মাণ্ডিয়ে বেড়াব স্কন্ধে ল'য়ে ঝুলি,
কণ্ঠ কহে কবে পিব করে তুলি,
অঞ্জলি অঞ্জলি জল যমুনার॥"

গোস্বামী। মা, তুমিও একটি নামগান করো শুনি। তুমি ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাসিনী—কি মূর্ত্তিমতী ভক্তি,—সত্য বোল্‌চি মা, এখনো আমি বুঝ্‌তে

পাচ্চি না। যেই হও, তুমি আমার মা, আমি তোমার সন্তান ;—সন্তানকে রামকৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষিত করো জননি !”

“জয় রাম,—জয় রামরূপ,—জয় ভক্তবৎসল ভগবান্ !”—উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিতে বলিতে, সেই ভক্তিমতী সন্ন্যাসিনী অথবা সরমা—মধুর কণ্ঠে গাহিলেন,—

“হরি হরি বল,　　　গোনা দিন গেল,
কবে হবে মন চেতনা রে।
মায়ার ছলনে,　　　কামিনী কাঞ্চনে,
কত জন্ম আর কাটাবি রে॥
(শ্রীহরি নাম নিবিনি কিরে)
(হায় হায় তোর সকলি গেল)
(দীনবন্ধুর স্মরণ বিনে - সকলি গেল)
জীবন গোঁয়ালি,　　　কত ব্যথা পেলি,
ভুলে গেলি সব কি কোরে রে।
আবার কাঁদিবি,　　　আবার হাসিবি,
আবার মাতিবি, নেশায় রে॥
(এমন তো আর দেখি নারে)
(তোর মত হতভাগ্য—আর দেখিনারে)

(সকল পেয়ে কিছু নাই তোর—দেখিবারে)

দেখে তোর দুখ, ফেটে যায় বুক,

কৈ কোথা সুখ, বল্ দেখিরে ।

হরিনাম বিনে, তরিবি কেমনে,

একবার তাহা ভাবিলি নারে ॥

(পারের সম্বল নাম বিনে রে)

(জীবন-সম্বল হরিনাম বিনে)

(মানব-জন্মের নিশানা বিনে)

রামকৃষ্ণ রূপে নরদেহ ধরি,

এসেছেন হরি, চল দেখি রে ।

বড় দয়া তাঁর, প্রেম-অবতার,

পতিতে উদ্ধার করেন ওরে ॥

(এই তাঁর ব্রত রে)

(এবার এই জন্যে তাঁর আসারে)

(দীন কাঙ্গালবেশে আসারে)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"সত্য বলো, —তুমি কে?"

"মার সেবক—তোমার আশ্রিত—পূজারি ব্রাহ্মণ।"

"উঁহুঁ, তুমি সামান্য নও।" (স্বগত) "কোনরূপ ইন্দ্রজাল নয় ত?"

"বেদেরা ভেল্‌কী খেলে দেখনি? যদি কিছু দেখে থাকো ত, সেই ভেল্কী বোলে মনে কোরো।"

প্রশ্নকারীর বুক কাঁপিয়া উঠিল,—"একি! এ মনের কথা জানিতে পারে কিরূপে?"

অন্তর্য্যামী মহাপুরুষ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ঐ যে তোমরা ইংরেজীতে thought-reader না কি বল না,—আমিও তাই।" মুখের পানে

চেয়ে ও দেখ্‌চ কি ? আঁকুড়ে ক, আর কাঠাকালি পর্য্যন্ত বিদ্যে ;—নইলে আর কৈবর্ত্তের বামুনগিরি করি ?”

প্রশ্নকারী একটি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “কিন্তু আমি যে স্পষ্ট—এই দিনের বেলায় দেখ্‌লেম! নিজের চোখকে অবিশ্বাস করি কিরূপে ?”

“কি দেখ্‌লে বলো দেখি ?”

বক্তা একটি নিশ্বাস ফেলিয়া ছলছল চক্ষে কহিলেন, “যা দেখ্‌লেম, তা কল্পনারও অতীত। দেখ্‌লেম, তুমি এই মন্দির-প্রাঙ্গণে পাদচারণ করিয়া বেড়াইতেছ, আর মা-কালী বরাভয়দায়িনী মূর্ত্তিতে তোমার অঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছেন। সম্মুখে তোমার এই স্বাভাবিক পুরুষ মূর্ত্তি, আর তুমি পশ্চাৎ ফিরিলেই যেন মা-আনন্দময়ীর সেই ভুবন মোহিনী মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাই।—যেন একাধারে হরগৌরী!—অভূতপূর্ব্ব, অলৌকিক, ধ্যানের অতীত,—কে তুমি মহাত্মন ? কৃপা করিয়া সত্য বলো,—তুমি কে ?”

“কে আবার ? তোমারই মত—দুই হাত দুই পা মানুষ। তুমি—ও কি দেখ্‌তে কি দেখেছ।”

"না, দৃষ্টিভ্রম নয়, কল্পনা নয়,—প্রত্যক্ষ বাস্তব জ্বলন্ত সত্য।"

"তবে ভক্তের উক্তি মনের মধ্যে ধ্যান করো,—

"বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর।"

"সত্য, ভক্তের এই অমৃতময়ী উক্তিই একমাত্র প্রমাণ,—

"বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর।"

"আচ্ছা কি দেখ্‌লে, আর একবার ভাল কোরে ভাবো দেখি ?—এখন আর কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছ ?"

"না। তাই ভাব্‌চি, একি কোন প্রহেলিকা ? এই দেখ, এখনো আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। সত্য বলো ব্রাহ্মণ,—তুমি কে ?"

"বোলেচি ত ? দরিদ্রব্রাহ্মণ—রাম চাটুয্যে—তোমাদের একজন ভেতুড়ে। মার সাজ-গোচ পূজো-আচ্ছা করি,—আর দিব্বি ভাত মারি।"

"বাবা, আর অমন কথা বোলে আমাদের অকল্যাণ কোরো না,—সত্যই তুমি মা-কালীর কৃপা পেয়েছ !"

(একটু হাসিয়া) "আর কিছু নয় ?—ও ! এখনো তোমার ভাবের ঘরে চুরি ?"

(স্বগত) "ভাবের ঘরে চুরিই বটে!—হায়! এমনি সংস্কার ও আত্মবঞ্চনা যে, চোখে দেখেও অবিশ্বাস হয়।"

"কি,—ভাব্‌চ কি? এখান থেকে আমায় তাড়াবে না ত?"

"বাবা, তোমায় তাড়াবো?—তা হোলে কি নিয়ে সংসারে থাক্‌বো? তাড়াবো না,—এই বাগান, দেবালয়, মন্দির—আর কিছু কোম্পানীর কাগজ—সব তোমায় দিয়ে যাবো, তাই ভাব্‌চি। কেন না, কখন আছি, কখন নেই,—ছেলেরা কে কি করে। তাই তোমার নামে এই আট দশ লাখ্‌ টাকার সম্পত্তি, একেবারে লিখেপোড়ে দিয়ে পাকা কোরে যাবো ভাব্‌চি।"

"আমায় লিখে-পোড়ে দিয়ে পাকা কোরে যাবে?"—জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ হো হো হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসিতে দিব্য একটি অনাসক্তি ও উপেক্ষার ভাব প্রকাশ পাইল, এবং সেই জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডলে সম্পূর্ণ নির্লোভিতার ছবি ফুটিয়া উঠিল। বক্তা যথেষ্ট অপ্রতিভ ও কুণ্ঠিত হইলেন। যেন মরমে মরিয়া গেলেন।

বুঝিলেন, কাহার সম্মুখে কি বলিয়া ফেলিয়াছেন। ষড়ৈশ্বর্য্য- শালী ভগবান্ যিনি,—তাঁহাকে ধনের প্রলোভন ?

অন্তর্য্যামী, ভক্তের মনোভাব বুঝিলেন। ভক্তকে সান্ত্বনা করিবার জন্য তখনই আবার দীনতার স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "কি জানো বাবা, আমি একটা হাড়-হাভাতে বামনের বলদ,—অত টাকার সম্পত্তি হজম কোত্তে পারবো কেন ? এই দেখ, তুমি সবে দেবো বোলেছ,—এই না শুনে— নিতে হবে বোলে, হাতের এই আঙ্গুল টাঙ্গুল গুলো কেমন তিউড়ে কুঁক্‌ড়ে বেঁকেচুরে যাচ্চে। তা মরুক গে, ও সব কথায়।—এখন তুমি একটা গান শোন।"

এই বলিয়া ঠাকুর আপন দেবতুর্লভ কণ্ঠে গান ধরিলেন,—

"আপনাতে মন আপনি থেকো,
যেয়োনাকো কারো ঘরে।
যা চাবি তাই ব'সে পাবি,
খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥

পরম ধন এই পরশমণি,
যা চাবি তাই দিতে পারে।
কত মণিমুক্তা পোড়ে আছে,
আমার চিন্তামণির নাচ-দুয়ারে॥"

গান সমাপনান্তে কহিলেন, "কেমন বাবা, এই না?"

ভক্ত ভাবিলেন, "সত্য। চিন্তামণিকে যে চিনিয়াছে, তাহাকে কি ছার ধনৈশ্বর্য্যে তুষ্ট করিব! কি অর্ব্বাচীনের মত প্রস্তাবই করিয়া ফেলিয়াছি।"

"আচ্ছা, আর একটা গান শোন।"

ঠাকুর তাঁহার সেই স্বভাবসিদ্ধ সুধাকণ্ঠে আবার গাহিলেন,—

"ভেবে দেখ মন, কেউ কারো নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
ভুলনা দক্ষিণাকালী, বদ্ধ হোয়ে মায়া জালে।
দিন দুই তিনের তরে, কর্ত্তা বোলে সবাই মানে,
সেই কর্ত্তাকে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্ত্তা এলে॥
যার জন্য মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে,
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া, অমঙ্গল হবে বোলে॥"

কোটিপতি উদ্যান-স্বামী—সেই ভক্তিমতী অন্নপূর্ণার প্রিয়তম দৌহিত্র—ভাগ্যবান্‌ কেশবচন্দ্রের

প্রাণ উদাস হইয়া গেল, হৃদয় ভক্তিতে ভরিয়া উঠিল। ভাবিলেন, "সত্য। সকলই অনিত্য,—দু'দিনের জন্য এই কর্ত্তৃত্বাভিমান। কার জন্য এ বন্ধন? হায়! এ মায়া-পাশ কি ছেদন করিতে পারিব না?—কিন্তু কে এ ব্রাহ্মণ? সত্যই কি ছদ্মবেশী ভগবান্?"

ঠাকুর বলিলেন, "তা তোর দোষ নেই,—তুই কতটুকু? ঐ যে কথায় বলে—'পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্মা পোড়ে কাঁদে।' তা তোর সংশয় হবে না? হবে বৈকি। তা যাবে,—সময় হোলেই যাবে। এখন তুই কি খাবার এনেচিস, দিবি চ।—খালি পেটে আর মার নাম ভাল লাগে না।"

"আহা, কি সরল ভাব!—ঠিক যেন বালকের স্বভাব।—ভাবরূপী জনার্দ্দন! ভক্তের প্রণাম লও।"—উদ্যানস্বামী কেশব ভক্তি ভরে ঠাকুরকে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিলেন। এবং পরম সমাদরের সহিত—ভক্তিভরে-আনীত খাদ্যসামগ্রীগুলি তাঁহাকে খাওয়াইলেন;—নিজেও সেই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

তারপর কি ভাবিয়া ঠাকুরের জননীকে দেখিতে

গেলেন। জননী তাহার একটু দূরে—নহবৎখানার ঘরে থাকেন। তিনি তখন একখানি ক্ষুদ্র শিলে করিয়া গুল প্রস্তুত করিতেছিলেন। কোটিপতি কেশব প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। মাতা সস্নেহে জিজ্ঞাসিলেন,—"কি বাপ, সব কুশল ত? আজ কি মনে কোরে একেবারে এ নবৎখানার ঘরে এলে? রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হোয়েছে ত?"

"হাঁ মা, হোয়েছে।—আমি তোমার চরণ বন্দনা কোত্তে এয়েছি।"

"সুখে থাকো, আরো ধর্ম্মশীল হও, আমার মাথার চুলের মত প্রমাই হোক।"

"মা, আমি একটি মানস কোরে এসেছি, তোমায় তা পূরণ কোত্তে হবে।"

"কি বাবা, বলো,—আমার আয়ু দিলে যদি পোরে, তো কোর্‌বো।"

"না, এমন কিছু নয় মা,—এই বাগান, বাড়ী, দেবালয়, আর কিছু কোম্পানীর কাগজ আমি তোমার পাদপদ্মে উৎসর্গ কোর্‌বো,—তোমায় নিতে হবে।"

বৃদ্ধা একটু হাসিয়া কহিলেন, "বাবা, এ সব ধন-

দৌলৎ নিয়ে আমি কি কো'রবো? আমার ত কিছুই অভাব নেই?"

"না মা, তোমায় নিতেই হবে। ঠাকুরকে বোল্লেম, তিনি রাজী হোলেন না,—তোমায় নিতে হবে।"

বৃদ্ধা এবার এক-গাল হাসি হাসিয়া, হাসিতে সম্পূর্ণ অনাসক্তির ভাব দেখাইয়া বলিলেন, "বাবা, আমার রামরূপ রোয়েচে, তোমার মত এমন রাজা-ছেলে পেয়েচি, নিত্য মার প্রসাদ পাচ্চি, তোমার কল্যাণে এমন গঙ্গাতীরে বাস কোচ্চি,—টাকা-কড়ি বিষয়-সম্পত্তি—এ সব নিয়ে কি কর্‌বো বাপ? এ সব তুমি তোমার নাতি-পুতিকে দিয়ে দাও, তা হোলেই আমাদের নেওয়া হোলো।"

"তবে কিছুই নেবে না মা? আমার মনের মানস—"

বড় দৃঢ়তার সহিত, একটু আক্ষেপভরে, কেশব একথা বলিলেন। স্নেহময়ী জননী দেখিলেন, ভক্ত ক্ষুণ্ণমনা হইতেছে; তাই তখনি সহানুভূতির অমৃতশীতলকণ্ঠে বলিলেন, "তা বাপ, একান্তই মানস করিয়া আসিয়াছ, তবে কিছু দাও,—আমায় এক

পয়সা দোক্তা কিনিয়া দাও।—তা' হোলেই তোমার দান সিদ্ধ হোলো,—আমারো নেওয়া হোলো।"

ভক্ত আর কিছু না বলিয়া, বলিতে না পারিয়া, অশ্রুসিক্ত মুখে, গদ্গদকণ্ঠে, আপনা আপনি কহিলেন, "এমন না হইলে মা, আর তোমার গর্ভে সাক্ষাৎ ভগবান্ স্থান পান? রত্নগর্ভা জননি! অজ্ঞান সন্তানের অপরাধ মার্জ্জনা কর।"

ভক্তির অনাবিল অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া, মনে মনে কোটী প্রণাম করিতে করিতে, কোটিপতি ভক্ত কেশবচন্দ্র—তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। অতি উচ্চভাবে হৃদয় পূর্ণ করিয়া, তিনি ভাগীরথী-তটে গিয়া বসিলেন।

সহসা ঘোর রোলে কাঁসর-ঘণ্টা দামামা বাজিয়া উঠিল। ভক্ত দ্রুতপাদবিক্ষেপে দেবীর আরতি দর্শনে গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

অদ্ভুত সে আরতি, অদ্ভুত সে দেবী-পূজা ভক্ত রামরূপ পূজকরূপে দেবীর আরতি করিতেছেন।

জাগ্রতা কালিকাদেবী। মা স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা। উজ্জ্বল দীপালোকে মন্দির আলোকিত। সুগন্ধ ধূপ-ধূনা গুগ্‌গুলে চারিদিক্ আমোদিত। মা হাসিতেছেন। ভক্তের ভক্তি-আকর্ষণে হাসিতেছেন। আনন্দপ্রাণ পূজকের নিষ্ঠাগুণে আনন্দময়ী হইয়া হাসিতেছেন। ভক্তের হৃদয়-দর্পণে সে মহাভাবের প্রতিচ্ছবি পড়িয়াছে; তাই ভক্ত রামরূপ তন্ময় হইয়া, একরূপ বাহ্যজগৎ ভুলিয়া, দীর্ঘকাল ধরিয়া মার আরতি করিতেছেন।

দক্ষিণ হস্তে বৃহৎ পঞ্চপ্রদীপ, বামহস্তে তদুপযোগী ভারযুক্ত ঘণ্টা ;—হাত ভারিয়া গিয়াছে, একরূপ অসাড় হইয়া যাইতেছে, সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছে,—তাঁহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই,—আপন মনে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া, হেলিয়া দুলিয়া মস্তক সঞ্চালিত করিয়া, গভীর ভক্তি-অনুরাগ সহকারে আরতি করিতেছেন। কখন বা গম্ভীর মা মা স্বরে মন্দির প্রতিধ্বনিত করিয়া, সমাগত দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে ভক্তির অমৃতধারা ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু যে যে ব্যক্তি কাঁসর, ঘটিকা ও দামামা বাজাইতেছিল, বহুক্ষণ হইতে তাহাদের হাত ভারিয়া উঠিয়াছে, বিলক্ষণ কষ্ট হইতেছে, এমন কি, তাহারা গলদ্ঘর্ম্ম ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে,—তাহাদের হাত আর চলেনা। মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেও পারেনা, পূজককে নিষেধ করিতেও পারেনা,—তাহাদের অবস্থা একরূপ সঙ্কটাপন্ন।

আরতি সাঙ্গ হইল, তাহারা হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। বহুক্ষণ ধরিয়া দম্ ফেলিল। কেহ কেহ বা, দেবীপ্রণামচ্ছলে সেই সুশীতল মর্ম্মরপ্রস্তর তলে সটান শুইয়া পড়িল। মনে মনে 'আ !' বলিয়া, দীর্ঘ-

কাল ধরিয়া, বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতে লাগিল। পূজক বা পূজার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবার কাহারো আর অবসর হইল না।

তখন পূজক যাহা করিতেছিলেন, তাহা আরো অদ্ভুত। অষ্টধাতুনির্ম্মিত প্রস্তরময় মার পাদপদ্ম আঁকড়িয়া ধরিয়া, কখন তাহাতে মাথা ঠুকিতে লাগিলেন, মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে কখন বা মাকে উদ্দেশ করিয়া কি বলিতে লাগিলেন। যেন প্রত্যক্ষ-ভাবে মাকে দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতে-ছেন, তাঁহার নিকট আব্দার করিতেছেন,—এমন কি, কখন বা 'তুই-তোকারি' ও গালি-গালাজ করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেছেন না।—সে এক অদ্ভুত দৃশ্য।

মার মন্দিরের অনুচর কর্ম্মচারী ও দর্শকগণের মধ্যে, কাহারো কাহারো চক্ষে এ দৃশ্য নূতন নয়, সুতরাং আশ্চর্য্যেরও নয়,—দেখিয়া দেখিয়া ইহা তাহাদের একরূপ সহিয়া গিয়াছে, পুরাতন হইয়াছে। সুতরাং কাহারো নিকট ইহা প্রকৃত ভক্তি-ভাবোদ্দীপক, কাহারো কাছে বা একটু বিসদৃশ; আর কেউ কেউ বা—ইহা বেল্কুমো ও ভড়ং বলিয়া ভাবে। যার যেমন মন।

বিশেষ পূজার ব্যাপারটা আরো কিছু বিচিত্র রকমের। মাকে পূজা করিতে করিতে, পূজক কখন কখন আপনাকেই পূজা করে, আপনার মাথায় পুষ্পাঞ্জলি দেয়, চন্দনের ছিটা-ফোঁটা আপন অঙ্গেই লিপ্ত করিয়া থাকে। লোকে দেখিয়া শুনিয়া অবাক্। কর্ম্মচারীরা ভীত, সন্ত্রস্ত, একটু বিরক্ত। কেহ কেহ বা রাগ-রোষ করিয়া, কখন কখন কর্ত্তৃপক্ষীয়ের কানেও সে কথা তোলে।

শুধু ইহাই নহে, কোন দিন বা পূজা করিতে করিতে নৈবেদ্যের খাদ্যসামগ্রী, 'মা মা' বলিয়া দেবীর মুখে ধরে, পরক্ষণে হয়ত তাহাই আবার হাসিতে হাসিতে আপনিই খাইয়া ফেলে। এইরূপ ভাবোন্মাদ, ভক্তি-উন্মাদ, প্রেমোন্মাদের সঙ্গে ভক্তের মানসপূজা সাঙ্গ হয়,—কোন দিন বা ইহা-পেক্ষাও বাড়াবাড়ি হয়।—আজ তাহাই হইল।

আরতি হইয়া গেল, পূজক দেবীপ্রণামচ্ছলে, বহুক্ষণ দেবীর পাদপদ্ম আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিলেন, তাহাতে মাথা ঠুকিলেন, কখন আপনা আপনি কি বলিতে লাগিলেন। তার পর শীতলের দ্রব্যাদি যথারীতি নিবেদন করিয়া,—'খাও মা খাও' বলিয়া

দেবীর মুখে দুগ্ধপাত্রটি ধারণ করিলেন। মা খাইলেন দেখিয়া, প্রথমে অনেক অনুনয় বিনয় ও স্তবস্তুতি করিলেন, একটু কাঁদিলেন, শেষ রাগিয়া ভৎর্সনা আরম্ভ করিলেন,—"খাবিনে বেটা? ভালয় ভালয় বলিতেছি, খা,—নইলে মার্ দিব। বটে! কথা কচ্চিস না? ছেলেকে হেনেস্তা কোল্লি? আচ্ছা, আমিও এর অষুধ জানি। এই দ্যাখ্, তোর সাম্‌নে এই কোশা মাথায় মারিয়া আমি রক্তপাত করি।—এখনো বোল্‌চি, খা!—হাঁ, এই বেশ, শান্ত শিষ্টটির মত সেই ত খেলি,—তবে খামকা কেন আমায় কাঁদালি বল্ দেখি?"—বলিতে বলিতে মহা ভাবাবেশে, সেই পাত্রস্থ দুগ্ধ—নিজেই গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলেন। দর্শকগণ অবাক্ হইয়া রহিল,—ভীতি-বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে পরস্পর পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

মন্দির-স্বামী আজ স্বয়ং স্বচক্ষে এই অভূতপূর্ব্ব অলৌকিক দৃশ্য দেখিলেন। ভয় ও ভক্তিতে তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। উপস্থিত দর্শক ও অনুচরবৃন্দকে তিনি সেখান হইতে চলিয়া যাইতে

ইঙ্গিত করিলেন। মন্দিরের দ্বারদেশে তিনি একাকী বসিয়া রহিলেন।

ইতাবসরে ঠাকুর রামরূপ একবার হুম্‌কী ছাড়িয়া উঠিলেন,—"তোরা শালারা এখনো এখানে বোসে আছিস্ কি কোত্তেরে? আরতি হোয়ে গেল, মাকে শোয়াবো,—তোরা যে যার কাজে যা না? হাঁ কোরে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিস কিরে শালারা?"

"বাবা, সব্বাই গিয়াছে,—আমিই একাকী আছি।"—মন্দির-স্বামী, ভক্ত কেশবচন্দ্র, অতি বিনীতভাবে এই কথা বলিলেন।

"কেন, তুমি পীর নাকি? তুমিও সোরে পড়ো।"—একটু রুক্ষস্বরে ঠাকুর এই উত্তর দিলেন।

অগত্যা কেশবও প্রস্থানোদ্যত হইলেন। মনে মনে কহিলেন, "বাবা, তোমার এ ভক্তি-উন্মাদ, হীনবুদ্ধি আমি,—কি বুঝিব? যথা ইচ্ছা তোমার, করো,—আমার বলিবার বা বুঝিবার কিছুই নাই।"

অন্তর্য্যামী ভক্তের অন্তর বুঝিলেন, তাঁহার মনের কথা শুনিলেন। তাই কি ভাবিয়া বলিলেন, "তবে তুই থাক্। তোর থাকবার ইচ্ছা হোয়েছে, থাক্। হাঁ, তোর চোখ, ফুটি-ফুটি হোয়েছে,—তুই

এখন থাক্‌তে পারিস বটেন—হাঁ দেখ্, মার এই খাটখানা কিছু ছোট হোয়েছে। মায়-পোয় শুলে, এতে কুলোয় না। এই দ্যাখ্, আমি শুলে আর মার শোবার জায়গা থাকে না,—বড় ঘেঁসাঘেঁসি হয়।”

অম্লানবদনে এই কথা বলিয়া, পূজক রামরূপ—দেবীর সেই সুসজ্জিত শয়ন-খট্টায় গিয়া শয়ন করিলেন। অন্যের অবোধ্য ভাষায়,মাকে উদ্দেশ করিয়া, কি বলিলেন। একটু হাসিলেন, একটু কাঁদিলেন। তারপর যথারীতি শয্যা ঝাড়িয়া, মশারি ফেলিয়া মাকে যেন শয়ান করিয়া রাখিয়া আসিলেন। নির্ব্বিকার দিগম্বর বেশ। ঠিক্ যেন পঞ্চম বর্ষীয় শিশু। পরিধেয় বসন বগলে করিয়া দেবীগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মুখ উচ্ছিষ্ট, সর্ব্বাঙ্গে পদ্মগন্ধ।

এতক্ষণে যেন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। জাগ্রৎ সমাধি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। স্নেহপরিপ্লুতস্বরে, হাসি হাসি মুখে মন্দিরস্বামীকে কহিলেন, “সেজ বাবু, কতক্ষণ? সেই পর্য্যন্ত আছ?”

সেজবাবু ওরফে কেশব—বিনীতভাবে বলিলেন, “আজ্ঞা হাঁ।”

ঠাকুর। হাঁ, দেখ, তোমায় একটা কথা বোল্‌বো মনে কোচ্ছিলুম;—আমার এ চাকরীটে তুমি খসিয়ে নাও। বুড়ো-হাব্‌ড়া হোয়ে পোড়্‌তেছি,—আমার আর এ পোষায় না। এখন নিত্যি—এই তিনশ তিরিশ দিন—দেবীর পূজো করা, ভোগ-রাগ দেওয়া, শীতল দেওয়া—এ সব আর আমার পোষায় না। পূজোর মন্তোর ভুলে যাই, কি বোল্‌তে কি বোলে ফেলি-—মার পূজো কোত্তে গিঁয়ে হয়ত নিজের পূজো কোরে বসি।—হাঁ, আমায় এখন পেন্‌সন দাও।

কেশবচন্দ্র আর কোন কথার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলেন না,—বিনীতভাবে বলিলেন, "যে আজ্ঞা, আপনার যেরূপ অভিরুচি।"

মনে মনে কহিলেন, "ইহারই নাম বুঝি ব্রহ্মজ্ঞান।—অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য!—ভক্ত ও ভগবান্ অভেদ, একাকার। অথবা ইনিই যে সেই তিনি নন,—কে বলিবে?"

ঠাকুর। (ঈষৎ হাসিয়া) যা ভাব্‌চ, তাই,—আমি আর আমাতে নাই। মা বেটী সব উল্‌টে পাল্‌টে দিয়েছে। এ কাট্‌মা দিয়ে আর বেশী-

দিন সংসারে সং দেওয়া চোল্‌বে না। এখন তোমার মনের কথা কি, বোলে ফেল।—তুমি অমন ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ কোরে আমার পানে চেয়ে,ও দেখ্‌চো কি ? —ওঃ ! ন্যাংটা হোয়ে আছি—না ? দেখ দেখি, বুড়ো মিন্‌সের কি আক্কেলটা একবার !

বলিতে বলিতে সরল শিশুর ন্যায় বগলদাবা হইতে কোন রকমে কাপড়খানা কোমরে জড়াইয়া রাখিলেন মাত্র।

ভক্ত কেশব জিজ্ঞাসা করিলেন,"প্রভু, ব্রহ্মজ্ঞান কারে বলে ?"

ঠাকুর হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"ঐ ও-পাড়ায় যাস না একদিন,—শুন্‌বি তখন।"

"কৃপা কোরে আপনি বলুন।"

"আরে পাগল,একি বল্‌বার কথা যে বোলবো ? বোবার স্বপ্নদর্শন কি বোবায় বোলতে পারে ?— না, নুনের মানুষ সমুদ্রে জল মাপ্‌তে গিয়ে জল থেকে ফিরে আসে ? যার হোয়েছে, সেই বুঝেছে। শুকদেবের হোয়েছিল, জনক রাজার হোয়েছিল,— তাঁরাই তা বোল্‌তে পাত্তেন।"

"আর চোখে দেখ্‌লেম,—আপনার হোয়েছে।"

"ওঃ! এঁচেচিস বড়,—thank you. কোন্ কোন্ লক্ষণে বুঝ্লি?"

"পরমহংসের যাবতীয় লক্ষণ আপনাতে বিদ্যমান আর—"

"ওঃ! সেই নেটো বোলেছিল,—পরমহাঁস। হাঁস যখন, তখন সকলে বাঙ্গ কোত্তে থাক্‌বে,—প্যাঁক্, প্যাঁক্, প্যাঁক্!—তুইও বল্—'প্যাঁক্, প্যাঁক্, প্যাঁক্'—কেমন?" (হাস্য)

"প্রভু, আর আমায় ভোলাতে পার্‌বেন না,—আমি স্বচক্ষে সব দেখেছি, সব বুঝেছি।"

"বুঝেচিস? তবে তুই ত দেখচি একজন মস্ত মদ্দ! দ্যাখ্, তোরা এই হাঁস মাস কত কি আমায় বলিস, আমি কিন্তু এই টুকু বেশ বুঝেচি যে, কিছুই বুঝিনে।"

উত্তর পাইয়া ভক্ত একটু অপ্রতিভ হইলেন। কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছেন ভাবিয়া, অপ্রতিভ হইলেন। অন্তর্য্যামী তাহা বুঝিলেন। ঈষৎ হাসিতে হাসিতে কহিলেন,

"ব্রহ্মজ্ঞান কি রকম জানিস? যখন তোর মনে হবে, এই মন্দিরে বোসে যে মা-কালী,

ইষ্টি-আরাধনায় নিত্যি পূজো খান,—তিনিই আর এক রূপে—মেছোবাজারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে—হাতে হুঁকো কোরে মানুষ ডাকেন। এতটুকুও অতিরঞ্জিত বা কল্পনা নয়,—ঠিক এই ভাব জানিস; এই রকমই ঠিক্ মনে হওয়া চাই। বিষ্ঠায় আর চন্দনে,কাদায় আর কাঞ্চনে ভেদজ্ঞান থাক্‌বে না,—সেই হোলো ব্রহ্মজ্ঞান।—বুঝ্‌লি কিছু?"

ভক্ত অধোবদনে একটু স্তব্ধ থাকিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। পরে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"ভগবান্ কেমন?"

ঠাকুর সহাস্যে উত্তর দিলেন,—"তুই ভাবিস যেমন?"

"যেমনটি ভাবিব?"

"ঠিক্—তাই—হুবহু।"

"গুরু কে?"

"সেই সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবান্।"

"গুরুর প্রয়োজন কি?"

"জুটিয়ে দেয়—তুই যা চাস্।"

ভক্ত একটু স্তব্ধ হইলেন। নিমীলিত নেত্রে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর তাঁহার পৃষ্ঠদেশে একটি চাপড় মারিয়া কহিলেন, "তুই ও ধ্যান কোর্‌চিস, না তোর সরিক-দের সঙ্গে মাম্‌লার ফন্দি অ াটচিস ?"

চমকিত শিষ্য অবাক্ হইয়া ঠাকুরের পানে চাহিয়া রহিলেন,—একি! এখন কোথাও কিছু নাই,—কবে কোন্ সূত্রে কি মামলা হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া তিনি একবার চক্ষু মুদিত করিয়া-ছিলেন,—ইনি তাহা জানিতে পারিলেন কিরূপে ? ইহারই নাম কি দৈবশক্তি,—যোগবল ? অথবা সত্যই ইনি অন্তর্য্যামী ভগবান্ ?

সুতরাং আর কিছু না রাখিয়া ঢাকিয়া, ভক্ত কেশবচন্দ্র সমুদয় মনের কথা ব্যক্ত করিলেন। শেষ বলিলেন, "প্রভু আমরা বিষয়ী লোক ; সহসা কারো কাছে মাথা নীচু কোত্তে চাইনা,—কিন্তু মুক্তকণ্ঠে বোল্‌চি, আপনার কাছে আমার সকল দর্প, সকল অহঙ্কার চূর্ণ হোয়ে গেল। আমি সত্যই আপনার চরণে শরণ নিলেম,—আমার গতি কোরে দিবেন।"

ঠাকুর ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "কোরে দেবার মালিক—ঐ উনি। কোত্তেচেনও

সব উনি। আমরা আমিত্বের বড়াই কোরে মরি মাত্র।”

“মানুষের কি কিছুমাত্র কর্তৃত্ব নেই?”

“চোখের পলক ফেল্‌বার অবধি নেই। তাঁর হুকুম ভিন্ন এক তিল কেউ কিছু কোত্তে পারে না। তাই ভক্ত ভগবান্‌কে উদ্দেশ কোরে বলেন,—‘আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি ঘর, তুমি ঘরণী; আমি রথ, তুমি রথী;—যেমন চালাও, তেম্‌নি চলি; যেমন বলাও, তেম্‌নি বলি’।”

“এই অহংজ্ঞান বা আমিত্ব লোপ হয় কিরূপে?”

“আমিত্ব একেবারে লোপ হয় না,—সূতোর রেখার মত একটু দাগও থেকে যায়। নারকেলের ডাল শুকিয়ে ছিঁড়ে পোড়্‌লেও যেমন গাছে একটা কোরে দাগ থাকে, আমিকে হাজার মেরে তুমি কোল্লেও সেই রকম একটা আমিত্বের দাগ থেকে যায়। তা যখন এ আমি কিছুতেই যাবার নয়, তখন শিয়ানা যে, সে বলে—‘থাক্ শালা ঈশ্বরের দাস-আমি হোয়ে, তাহোলে আর কোন বালাই নেই’।”

“সে কিরূপ, অনুমতি করুন।—আমাদের এই আমি নিয়েই যত মারামারি, কাটাকাটি,—মূলে

ঝগড়ার বস্তু কিছু নেই,—ঐ আমির ছায়া নিয়েই ঝগড়া।”

“এমত অবস্থায় আমিত্বের প্রসার বাড়াতে পাল্লে,—এক নিবৃত্তি ও শান্তি। অর্থাৎ সর্ব্বভূতে আমিত্বদর্শন। কিন্তু সে বড় কঠিন কথা। তার চেয়ে দাস-আমি হওয়াই সুবিধাকর।”

কেশব। (স্বগত) ওঃ, কথাগুলা কি জ্বালাময়! ঠিক যেন বেদবাক্য।

“দাস-আমি”কি রকম জানো?—এই তোমাদের বড় মানুষের বাড়ীর চাক্‌রাণীরা যেমন। চাক্‌রাণী মুখে বলে, আমাদের ঘর, আমাদের বাড়ী, আমাদের বাগান; ছেলেদের মানুষ করেও আপনার ভেবে; কিন্তু মনে জ্ঞানে বেশ জানে যে, এ কিছুই তার নয়,—সবই তার মনিবের। তার মন পোড়ে থাকে—তার আপনার গাঁয়ের পানে।—কখন্ সেখেনে যাবে, দেখ্‌বে, শুনবে, কোর্‌বে।”

“ঠিক্ বোলেছেন। চাকরাণীরে ঠিক ঐ রকম কোরে থাকে বটে।”

“আর এক নষ্ট-মেয়ে। যে মেয়ে গোপনে নষ্ট হয়, সে ঘরের কাজকর্ম্ম যথানিয়মে করে, বরং

অন্য মেয়েদের চেয়ে বেশী কোরেও করে, কিন্তু তার মন পোড়ে থাকে সর্ব্বদা—তার সেই উপপতির উপর। কখন্ যাবে, কখন্ দেখ্‌বে, কখন্ তার সঙ্গে কথা কবে,—এই জন্যে সে মনের মধ্যে ছটফট কোত্তে থাকে।—সেই রকম কোরে যদি এই সংসারে থাক্‌তে পারিস,—মনটাকে ভগবানের কাছে রেখে, তাঁকে কর্ত্তা ভেবে চোলে যাস, তাহোলে সব ন্যাটা চুকে যায়। তোরা বিষয়ীলোক ; কোন কোন কাজে কোন বিশ্বস্ত লোককে ত আম্‌মোক্তার-নামা দিস : সেই রকমে যদি ভগবানের উপর ষোল-আনা আমোক্তার-নামা দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারিস, তাহোলে আর আমিত্বের বালাই নিয়ে তোকে মোত্তে হয় না। দিব্যি সব সোজাসুজি হোয়ে যায়।”

“প্রভু, আজ থেকে তবে আপনিই আমার আমোক্তার হোন্,—আমার আমিত্বের নাশ কোরে দিন।”

“হঠাৎ এ শ্মশান-বৈরাগ্যটি হোলো কেন ? সংসার দেখ্‌লেই ত আবার শ্মশান ভুল্‌বে ? পালে মিশেই ত আবার হাম্বা হাম্বা ডাক্‌তে থাক্‌বে ?”

ভক্ত নিরুত্তর, বুঝিলেন, কথাগুলা অক্ষরে অক্ষরে সত্য,—এক বর্ণও অতিরঞ্জিত নয়। নির্ব্বাক্ হইয়া তিনি ঠাকুরের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, "গাই-গরু দেখেচিস, কেমন তার বাছুরের জন্যে হাম্বা হাম্বা কোরে ডাকে? হাম্বা—কিনা হাম্। হাম্ অর্থে আমি। সেই আমি বলার কি দুর্দ্দশা ছাখ্। গরু কসাইয়ে মাল্লে, কাট্‌লে, তারপর তার চামড়া নিয়ে জুতো টুতো কত কি কোল্লে। ঢাক তৈয়ারী কোল্লে। তখনো সেই ঢাকের পিঠে চড়্‌বড়্ বাড়ী পোড়লো। তাতেও পার নেই,—তার নাড়া-ভুঁড়ী পর্য্যন্ত নিয়ে নির্য্যাতন করে। ধনুরীদের জন্যে তাঁত তৈয়ারী করে। সেই ধুনুরীর হাতে পোড়ে তবে ঢিট্ হয়—তখন 'হাম্' ছেড়ে তুঁহুঁ—তুঁহুঁ বোল্ বলে। এত কোরে তবে নিস্তার।—আমি বলার মজাটা দেখ্‌লি?"

"তবে প্রভু আমায় সংসার-আশ্রম থেকে সরিয়ে দিন।"

ঠাকুর হাসিয়া কহিলেন, "সংসার ছেড়ে যাবি কোথায়? বনে? সেখেনেও কি আমিত্বের হাত

এড়ান্ আছে রে ? দেখিস্‌নে, এক একটা সন্ন্যেসী, সিদ্ধাই ? রাগে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা,—কথায় কথায় ভস্ম কোত্তে চায়।—ওরে, বাপ্‌রে! সেও কি কম অহঙ্কার! তা নয়, 'এই সংসার আশ্রমই সকলের চেয়ে ভাল। ঋষিরা অনেক ভেবে চিন্তে এই আশ্রমেরই মাহাত্ম্য বাড়িয়ে গেছেন। বস্তুত ধর্ম্মচর্য্যার পক্ষে এমন স্থান আর নেই। খা, দা, ভগবানের নাম কর্, জীবের কল্যাণ কর্, অসুখ বিসুখের সময় ঔষধ পথ্য সেবা এ সব পাবি, দিব্বি ফূর্ত্তি কোরে বেড়াবি,—অহং ভাবটা একটু কমাতে পাল্লেই—বাস্।"

"কিন্তু আজকাল একান্নবর্ত্তী পরিবারটা একরকম উঠে যাচ্চে।"

"সেইটে হোয়েছে ত যত নষ্টের গোড়া। আহা, পাঁচজনকে নিয়ে মিলেমিশে থাকার চেয়ে কি আর আছে ? বোল্‌বে, কারো নয় দু'পয়সা বেশী যায়।—তা যাক্ না ? তেম্‌নি তার মাগ-ছেলের ওপর আর পাঁচজনের কত দরদ থাকে ? সে, আর পাঁচ রকমে কত সুবিধে পায় ? ধর্ম্মকর্ম্মে, আপদে বিপদে, পাঁচ জনের বল্ কত বল্!—একেল-

ঘেঁড়ে হোয়ে থাকার ফলে—তাঁতিকুল বৈষ্ণবকুল দুই যায়। মনে রিষ্ বাড়ে, মেজাজ খিট্‌খিটে হয়, ঈশ্বরে মন বসে না। এক হোয়ে থাকায়, মাঝে মাঝে একটু আধটু গোলমাল হয় বটে,—তা সে রকম গোলমাল কোন্ কাজে নেই? 'আপনি আর কোপ্‌নি' হোয়েও ত কেউ আপনার গলায় আপনি ছুরি দেয়, বিষ খায়, গলায় দড়ি দে মরে!—না রে না, সংসারে থাকিস,—কয় ভাই এক অন্নে থাকিস; মতান্তর মনান্তর হয়, ভগবান্‌কে ডাকিস, দুদিন পরে শুধ্‌রে যাবে। লোকের কান-ভাঙ্গানিতে হঠাৎ গরম হোসনে,—শত্রু হাসাস নে। বলক্ষয় হবে। চাম্‌চিকেয় এসে লাতি মেরে যাবে।"

কেশব। আহা! কি অমৃতময়ী উক্তি! (পরক্ষণে) কিন্তু——

ঠাকুর। কি বোল্‌ছিলি, বল্।

কেশব। কিন্তু সংসারে যে অনেক লোভ আছে? আপনিই ত বলেন, 'কামিনী-কাঞ্চনের' আসক্তি থাক্‌তে——

ঠাকুর। ছেলেদের 'বুড়ি ছোঁয়া' খেলা দেখিস

নে ? ঈশ্বরকে যদি সেই বুড়ী ছোঁয়ার মত কোন রকমে একবার ধোরতে পারিস, ত আর তোর মার্ কোথায় ? তখন জনক রাজার মত (সুর করিয়া)

"এই সংসার মজার কুটী।
আমি খাই দাই আর মজা লুটি॥
জনক রাজা মহাতেজা, তার ছিল কিসে ত্রুটি।
সে যে এদিক্ ওদিক্ দুদিক রেখে, খেলেছিল দুধের বাটি॥"

—কেমন, এই কিনা ? ভক্তি যে লাভ কোরেছে, তার আর কিসের ভয় ? তবে পাটোয়ারী-বুদ্ধি চালাস নে। ভক্তির ভড়ং দেখিয়ে—মনে বিষয়ী হোস নে।

কেশব। আজ্ঞে, পাটোয়ারী বুদ্ধি কিরূপ ?

ঠাকুর একটি গল্প করিয়া বলিলেন, "ভগবানের দেখা পেয়ে লোকটা বর চাইলে কিনা—'নাতির সঙ্গে একত্রে বোসে যেন সোনার থালে খেতে পাই।'—বাস্। একেবারে দীর্ঘ আয়ু, ঐশ্বর্য্য, বংশবৃদ্ধি—কৌশলে সব চাওয়াই হোয়ে গেল। এ রকম ভাবের ঘরে চুরি কোরে সংসার-নেশা কমানো যায় কি ?—দূর হোক্‌গে, ঝুঁটো কথাতেই দিন গেল।—বলো, জয় মা ব্রহ্মময়ী কালী!"

কেশব। জয় মা ব্রহ্মময়ী কালী।

ঠাকুর আপন দেবদুর্লভ কণ্ঠে গান ধরিলেন,—

"সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনমোহিনী।
তুমি আপনি নাচ,আপনি গাও,আপনি দাও মা করতালি ॥
আদিভূতা সনাতনী, শূন্যরূপা শশীভালী,
ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন, (ওমা) মুণ্ডমালা কোথায় পেলি ॥
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, আমরা তোমার তন্ত্রে চলি,
যেমন রাখ, তেম্‌নি থাকি মা, যেমন বলাও তেম্‌নি বলি ॥
অশান্ত কমলাকান্ত দিয়ে বলে গালাগালি,
এবার সর্ব্বনাশী, ধ'রে অসি, ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো খেলি ॥"

গান সমাপনান্তে ভক্তকে কহিলেন,"কেমন গো মশাই, এই কিনা? শোন, আর একটা গাই;—

"ভবে আসা, খেল্‌তে পাশা, কত আশা কোরেছিলাম।
আশার আশা ভাঙ্গাদশা, প্রথমে পঞ্জড়ি পেলাম ॥
পো-বারো আঠারো ষোল, যুগে যুগে এলাম ভাল।
শেষে কচে-বারো, পড়ে মাগো, পঞ্জা ছক্কায় বন্দী হলাম ॥"

কেশব। (সাশ্রুনয়নে) সত্যই "পঞ্জা-ছক্কায়" বন্দী হোলেম!

ঠাকুর। না, তা কেন গো? এই শোন তবে,—প্রসাদের সাধাসুরের অপূর্ব্ব সান্ত্বনা। সান্ত্বনাই বা বলি কেন,—সত্য। আহা,এমন সত্য আর হবে না!

পঞ্চমে সুর চড়াইয়া, মায়ের সেই মর্ম্মরনির্ম্মিত মঞ্চতলে বসিয়া, সেই নীরব নৈশাকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া, সুধাবর্ষী কণ্ঠে ঠাকুর গাহিলেন,—

"ডুব দেরে মন, কালী বোলে।
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে ॥

রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু'চার ডুবে ধন না পেলে,
তুমি দম্-সামর্থ্যে একডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে ॥
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে,
তুমি ভক্তি-করে কুড়ায়ে পাবে, শিব-যুক্তিমত চাইলে ॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে,
তুমি বিবেক-হলুদ গায়মেখে যাও, ছোঁবে না তার গন্ধপেলে ॥
রতন মাণিক্য কত, প'ড়ে আছে সেই জলে,
রামপ্রসাদ বলে, ঝম্প দিলে, মিল্‌বে রতন ফলে ফলে ॥"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর রামরূপ ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে বিভোর। অদ্ভুত সে কীর্ত্তন, অদ্ভুত সে আনন্দ। মধ্যে মধ্যে ভাব-সমাধি হইতেছে। কখন অর্দ্ধ চেতন, কখন সম্পূর্ণ চেতনা-রহিত। প্রাণ যেন দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া গিয়াছে,—শ্বাসপ্রশ্বাস, স্পন্দন, রক্ত-চলাচল—এসব একেবারে বন্ধ। কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ একটি সোনার মানুষ, যেন কলে দাঁড়াইয়া আছেন। পাছে পড়িয়া যান, এজন্য একটি ভক্ত, পশ্চাদ্দেশ হইতে তাঁহাকে আল্‌গোছে ধরিয়া রহিয়াছেন। মুখখানি হাসিমাখা, চক্ষু দুটি অর্দ্ধ নিমীলিত। ভক্তগণ মনোহর বেশে তাঁহাকে সজ্জিত করিয়া দিয়াছেন। দিব্য বারাণসী জোড়্ পরাইয়া,

কপালে কণ্ঠে বক্ষে চন্দন লেপিয়া, গলে সুন্দর সুবাসিত পুষ্পমাল্য দিয়া, তাঁহাকে উৎসব-আসরে আনিয়াছেন।

একটি ভক্তের বাটীতে এই উৎসব-সজ্জা হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অনেক ভক্ত তাহাতে যোগ দিয়াছেন। ভক্ত নয়, এমন অনেক লোকও কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য তথায় সমবেত হইয়াছে। তথাপি, সে অনিন্দ্যসুন্দর দিব্য-মূর্ত্তি যে দেখিল, সেই ধন্য হইল। সে মনোহর রূপ, তপ্তকাঞ্চননিভ সে উজ্জ্বল গৌর বরণ, সে জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডল, সে সুঠাম সুলক্ষণপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ,—সকলেরই মনপ্রাণ হরণ করিল। এক দিন এই সোনার বাংলায়—সোনার শ্যামসুন্দর—শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ ধরিয়া আসিয়াছিলেন; সে রূপের ছবিতে ভক্তবৃন্দকে মোহিত ও মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিলেন;—আর আজ এই প্রখর পাশ্চাত্য-সভ্যতালোক-সমাকীর্ণ, বিপুল জনকোলাহলপূর্ণ মহানগরীতে, সেই অনন্ত রূপময়—অনন্ত বিভূতি লুক্কায়িত রাখিয়া, নিরক্ষর দীন কাঙ্গালবেশে পতিতের উদ্ধার জন্য অবতীর্ণ। যে ভক্তি-

প্রেমের প্রবল বন্যায় একদিন 'শান্তিপুর ডুবু-ডুবু নোদে ভেসে যায়' হইয়াছিল, আজি প্রায় চারি শত বৎসর পরে, সেই মহাভাবের তরঙ্গ, এই সহরের বুকের উপর আসিয়া পড়িল। কিন্তু এবার বড় প্রচ্ছন্ন ভাবে, বড় গুপ্তলীলার অন্তরালে। অপিচ, যে ভাগ্যবান্ জন্মার্জ্জিত সুকৃতি-বলে সেই মুহূর্ত্তে তাঁহাকে দেখিল, দেখিয়া চিনিল, সেই ধন্য হইল ; আর যে সুকৃতী অভাবে তাঁহাকে দেখিল না,—দেখিয়াও চিনিতে পারিল না, সেই মরিয়া রহিল। 'কামিনী-কাঞ্চনের' এই ঘোর উপাসনাকালে,—বিলাসবিভ্রম মানযশ টাকা-আনা-পাই-নামের এই চরম সন্ধিস্থলে, যে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, সর্ব্ববিধ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া, ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণ অধিকারী হইয়া—বাক্যে, ব্যবহারে, দৃষ্টান্তে, উপদেশে – ত্যাগের মোহিনী ছবি রাখিয়া গিয়াছেন ;—কতরূপে, কতভাবে প্রেম-ভক্তির বীজ ছড়াইয়া গিয়াছেন ; গৃহীকে সংযমী, ঈশ্বর-বিশ্বাসী, শান্ত, সুধীর হইতে কত সহজ উপায় বলিয়া দিয়াছেন ;—এই ঘোর মত-বিরোধিতার কালে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিয়া, জলের মত তাহা

লোককে বুঝাইয়া দিয়া, ভক্ত ও ভাবুকের মন প্রাণ হরণ করিয়া, ঈশ্বররূপে পূজা পাইতেছেন ;—তাঁহার স্বরূপ-চিত্র অঙ্কিত করি, সে শক্তি কৈ ? তবে এক বিশ্বাস ও সংস্কার আছে যে, ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু তিনি,—যদি তিনি শক্তিসঞ্চার করিয়া দেন,—এ ক্ষীণ লেখনীতে নিজগুণে যদি তিনি আবির্ভূত হন,—তবে হয়ত তাঁহার অস্পষ্ট ছায়া-চিত্র আঁকিয়া, একদিন কৃতার্থ ও ধন্য হইতে পারিব। সেই আশ্বাসে এই ক্ষীণ প্রয়াস ;—নতুবা চটকচমক-প্রদ নায়কনায়িকার প্রণয়-আখ্যা ফেলিয়া, এ গুরুতর কঠিন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব কেন ?—কে-ই বা আমাকে এ পথে আনিল ?

ভক্তবৎসল ভগবান্ কীর্ত্তনানন্দে যোগ দিতে আসরে নামিয়াছেন মাত্র ; খোলধ্বনি হইল,—আর অমনি তাঁহার বাহ্যদশা—অর্দ্ধ বাহ্যদশায় পরিণত,—মন কারণ-শরীরে—কারণানন্দে মগ্ন।—ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে মধুরকণ্ঠে তাঁহাকে ঘিরিয়া "হরিবোল—হরিবোল" ধ্বনি করিতে লাগিলেন। অমনি সেই অর্দ্ধ বাহ্যদশা—অন্তর্দশায় পরিণত হইল,—মন মহাকারণে লীন হইল ;—একেবারে

নির্ব্বিকল্প জড়-সমাধি।—কে বলিবে, এ আধারে প্রাণ আছে ?

সাধারণ লোক্‌সমূহ সে জড়মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পাইল, ভাবিল, সাধুটি হরিনাম করিতে আসিয়া বুঝি মারা গেল।

কিন্তু তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ জানিতেন, এ সমাধি শেষ-সমাধি নয়। সাধারণ সাধকের পক্ষে এই শেষ বটে ; পরন্তু যিনি অবতার বা ভগবান্, তাঁহার ইহা শেষ নয়। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবেরও এইরূপ হইত,—ঠাকুর নিজে শ্রীমুখে ইহা বলিয়া গিয়াছেন।

অমনি একজন ভক্ত উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার কর্ণমূলে অমৃতময় 'মা মা' রব করিলেন, তিনিও ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তখনো কিন্তু মুখে অস্পষ্ট মা মা রব, স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় তিনি বাহ্যজ্ঞানলাভে সচেষ্ট,—ভাবের নেশা তখনো যেন সম্পূর্ণ কাটে নাই। অর্দ্ধজড়িতস্বরে সম্মুখস্থ গৃহী ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কোথায় ?"

ভক্ত। (কৃতাঞ্জলিপুটে) এ দীনের কুটীরে।

মুহূর্ত্তকাল পরে সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। ঠাকুর সহজ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। এবার সেই ভক্তটি পুনরায় বিনীতভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"বাবা, সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইবে কি ?"

"হাঁ, নামগান চলুক—এখনো আরম্ভ হয় নি ?"

ভক্তগণ গাহিলেন,—

"ভজ গৌরাঙ্গ, জপ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গ নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সেই আমার প্রাণ রে॥"

ভক্তগণ ঠাকুরকে বেষ্টন করিয়া এই সকল প্রচলিত পুরাতন নামগান করিতে লাগিলেন। এই সকল পুরাতন নামগান ঠাকুর ভালবাসিতেন। হয়ত তাঁহার মনোভাব এইরূপ,—"এই সকল বাঁধনদারেরা প্রকৃত ভক্ত ; আজ কালের মত কথার গাঁথুনি না থাক্,—ইহাতে আসল ভাবের জমাট আছে।"

ভক্তগণ ভক্তিসহকারে, গাহিতে লাগিলেন ; ঠাকুর তাঁহার দেবদুর্ল্লভ কণ্ঠে আঁখর দিয়া যাইতে লাগিলেন। উৎসব-সভায় ভক্তির তরঙ্গ বহিল। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রোতৃবর্গ শুনিতে লাগিল, ভক্তগণ গাহিতেছেন,—

"যাদের হরি বোল্‌তে নয়ন ঝরে,
তারা দু ভাই এসেছে রে।
তারা—তারা দু'ভাই এসেছে রে।
(যারা আপনি কেঁদে জগৎ কাঁদায়)
(যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে)
(যারা ব্রজের কানাই বলাই)
(যারা ব্রজের মাখনচোর)
(যারা জাতির বিচার নাহি করে)
(যারা আপমরে কোল দেয়)
(যারা আপনি মেতে জগৎ মাতায়)
(যারা হরি হোয়ে হরি বলে)
(যারা জগাই মাধাই উদ্ধারিল)
(যারা আপন পর নাহি বাচে)
জীব তরাতে তারা দু' ভাই এসেছে রে॥
(নিতাই গৌর)"

"চলুক—চলুক। ভাবে গর্গর মাতোয়ারা হও। সবাই মিলে একবার হরি হরি বল!"—স্বয়ং ঠাকুর এই কথা বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিলেন।

"হরি হরি বল---হরিবোল"—অমনি শত শত কণ্ঠে সেই মহাধ্বনির প্রতিধ্বনি হইল।

এবার ঠাকুর মধুর ভঙ্গিতে নাচিতে নাচিতে গাহিলেন, ভক্তগণও তাহাতে যোগ দিলেন,—

"গৌর-প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।
তার হিল্লোলে পাষণ্ড দলন
এ ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায়॥
মনে করি ডুবে তলিয়ে রই,
গৌরচাঁদের প্রেম-কুমীরে গিলেছে গো সই,
এখন ব্যথার ব্যথী কে আর আছে,
হাত ধ'রে টেনে তোলায়॥"

ঠাকুর অদ্ভুত ভঙ্গিতে নৃত্য করিতেছেন, ভক্তগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নাচিতেছেন, দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দ নির্ব্বাক্ ও মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে,—বহুক্ষণ ধরিয়া এই দৃশ্য চলিল। ঠাকুরের সেই সুন্দর সুঠাম সুসজ্জিত দেবমূর্ত্তি, তদুপরি এই মনোহর নামগান ও নৃত্য;—আবেগে ও আবেশে দরদর প্রেমাশ্রুপাত হইতেছে, সর্ব্বাঙ্গে পুলক ও ভাবের তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছে, মুখে স্বর্গের জ্যোতিঃ ও লাবণ্য মিশিয়া অতিবড় পাষণ্ডেরও মনপ্রাণ ক্ষণেকের জন্য আর্দ্র করিয়া ফেলিতেছে;—যেন সেই মুহূর্ত্তে মর্ত্ত্যে গোলকের মোহিনী ছবি অঙ্কিত হইল।

যেন স্বয়ং গোলকপতি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া প্রচ্ছন্নরূপে এই নৃত্যলীলা করিতেছেন। যেন রাসেশ্বর শ্রীরসিকশেখর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলে আসিয়া নৃত্য করিতেছেন। অথবা যেন সেই ভক্তাবতার ভগবান্ শ্রীশচীনন্দন শ্রীচৈতন্যদেব—এই অদ্ভুত রামরূপে মিশিয়া, একাধারে শ্রীরামকৃষ্ণ হইয়া, এই উৎসবানন্দে যোগ দিয়াছেন। ফলতঃ ভক্তগণ নাম-গানে ও সেই অলৌকিক নৃত্য-লীলার আকর্ষণে এমনি তন্ময় হইয়া গিয়াছেন যে, দেশকালপাত্র তাঁহারা সব ভুলিয়া গেলেন। গীতটি পুনঃ পুনঃ গীত হইতেছে,—সেই স্বর্গীয় নৃত্যলীলারও বিরাম নাই। তারকাবেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায় ঠাকুর সমভাবেই সেই মধ্যস্থলে বিরাজমান্; সেই অপূর্ব্ব নৃত্য-গান সমভাবেই চলিতেছে;—এবার যাই সেই শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হইল,—

"গৌর-প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।
তার হিল্লোলে পাষণ্ড দলন,
এ ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায়॥"

—অমনি একজন ভক্ত, যেন আবিষ্ট হইয়া, কাত্তনে

আঁখর দিবার ছলে, ঠাকুরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, – "এই গৌর।"

আর একজন ভক্তও অমনি ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহার উত্তর দিলেন,—"এই নিতাই।"

প্রথম ভক্ত। এই গৌর।

দ্বিতীয় ভক্ত। এই নিতাই।

"এই গৌর।"

"এই নিতাই।"

এখন এই 'গৌর-নিতাইয়ে' যেন দ্বন্দ্ব লাগিয়া গেল। ভক্তি ও ভক্তের—ভাবের দ্বন্দ্ব। অনেকক্ষণ ধরিয়া সে দ্বন্দ্ব চলিল। সে দ্বন্দ্বে, ভক্তের আসরে, ভক্তির তরঙ্গ-তুফান বহিতে লাগিল। আনন্দময় সদানন্দ পুরুষ—প্রেমের ঠাকুর—দিব্য আত্মানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই প্রেম-মন্দাকিনীধারাপূর্ণ শ্রীমুখ-পঙ্কজে—সেই একাধারে প্রকৃতিপুরুষের মহামিলনস্থলে—সেই হরগৌরীর মাধুরী মূর্ত্তিতে—কৌমুদীরশ্মির ন্যায় দিব্য হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল,—ভক্তি ও ভক্তের এই মধুর দ্বন্দ্ব যেন তাঁর বড় আরামপ্রদ, তৃপ্তিজনক বোধ হইল। তাই তিনি সেই হাসিকান্নাময় মুখে,

একরূপ অপরূপ স্বরে, পুনরায় গোড়া হইতে গাহিলেন,—

"গৌর-প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।
তার হিল্লোলে পাষণ্ড দলন,
এ ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায়॥"

সেই প্রথম ভক্তও অমনি যথারীতি সুর করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভাবে কহিলেন,—"এই গৌর।"

দ্বিতীয় ভক্তও তাহা দেখিয়া, অঙ্গুলিনির্দ্দেশ সহকারে, ত্রস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "এই নিতাই।"

এবার সহসা আর একটি তৃতীয় ভক্ত কোথা হইতে আসিয়া,—কার্য্যগতিকে তাঁহার আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল,—গায়ের গৈরিক আল্‌খেল্লা খুলিয়া ফেলিয়া, দ্রুতবেগে, একেবারে সেই কীর্ত্তন-সায়রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, এবং সেই জমাট আসরে, সুরে সুর মিলাইয়া, ঠাকুরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, আঁখর দিতে লাগিলেন,—"এই অদ্বৈত।"

চারিদিকে হরিধ্বনি পড়িয়া গেল। দর্শক ও শ্রোতৃবর্গ ভাবে মাতোয়ারা হইয়া, মুহুর্মুহু হরিধ্বনি করিতে লাগিল। ঠাকুর এই তৃতীয় ভক্তের আগ-

মনে, যেন প্রাণে নববলের সঞ্চার করিয়া, পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে গাহিতে লাগিলেন,—

"গৌর-প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।
তার হিল্লোলে পাষণ্ডদলন,
এ ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায়॥"

প্রথম ভক্ত যথারীতি আঁখর দিলেন,—"এই গৌর।"

দ্বিতীয়। এই নিতাই।

তৃতীয়। এই অদ্বৈত।

ঠাকুর পুনরপি টিপিটিপি হাসিয়া, সমাগত জনবৃন্দের মনপ্রাণ হরণ করিয়া, মধুর ভঙ্গিতে গাহিলেন,—

"গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।"

প্রথম ভক্ত। এই গৌর।

দ্বিতীয়। এই নিতাই।

তৃতীয়। এই অদ্বৈত।

অপরূপ ভঙ্গিতে নাচিয়া নাচিয়া ঠাকুর পুনরায় কীর্ত্তনস্বরে আবৃত্তি করিলেন,—

"গৌর-প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।
তার হিল্লোলে পাষণ্ড দলন,
এ ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায়॥"

এবার সেই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভক্ত এক-সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া, যেন তিনে একভাবে অণুপ্রাণিত হইয়া আঁখর দিলেন,—

"গৌর নিতাই অদ্বৈত।
"গৌর নিতাই অদ্বৈত।
"গৌর নিতাই অদ্বৈত।"

অমনি পশ্চাৎ হইতে একদল, সেই তানে তান ছুটাইলেন; ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া সমস্বরে গাহিলেন,—

"একাধারে—প্রেম-ভক্তি-জ্ঞান।
"ঐ আধারে—প্রেম-ভক্তি-জ্ঞান।
"হায় রে হায়—প্রেম-ভক্তি জ্ঞান।"

ভাবের মন্দাকিনীধারা ছুটিল। ভক্তির অনাবিল স্রোত বহিতে লাগিল। প্রেমের হিল্লোল—সকলকে ডুবাইয়া দিল। তখন আর বিচার বিতর্কের স্থান নাই। স্থান কাল পাত্র সকলে ভুলিয়া গেল।

কীর্ত্তন সমাপ্ত হইল। আসর নীরব, নিশ্চল, নিঃশব্দ;—সূচীপাত শব্দও যেন পরিশ্রুত হয়। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। চারিদিকে দীপাবলী শোভা পাইতেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—ঃ*ঃ—

সহসা সেই গম্ভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, সেই নীরব নৈশগগন কাঁপাইয়া, চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া, বামাকণ্ঠের মধুর ঝঙ্কারধ্বনি উঠিল,—

"রাম-নামের তরী বোয়ে যায়।
তোরা. কে যাবিরে পারে আয়॥"

শত শত মন্ত্রপূত পবিত্র আত্মা, ভাবনিমগ্ন স্থিরকর্ণে, শুনিতে লাগিলেন,—অদূর হইতে কে গাহিয়া আসিতেছে,—

"রামনামের তরী বোয়ে যায়।
তোরা কে যাবিরে পারে আয়॥
রাম বড়, না নাম বড়. সে বিচারে কাজ নাই।

তোরা মেলে আঁখি,দেখ্‌না সখি,ঐ সোনার তরী চোলেযায়॥
রাম সীতারে যে, দেখেছে চোকে,
তার কি আর রে জনম হয়রে এই নরলোকে,
সে যে কালের মুখে মেরে ডঙ্কা
সেই নাম সদাই গায়।—
সেই রাম-নাম সদাই গায়॥
লজ্জা মান ভয়, যার আছে—তার নয়,
সে যে,এ তিনের অতীত বস্তু,প্রাণ সঁপেছি তারি পায়॥
(ঐ রাম নামে গো।)
(এই রাম-রূপে গো।)
(এই যুগল-প্রেমে গো।)

ভক্তির জমাট-আসরে, সুমধুর রামনাম গান করিতে করিতে, সহসা এক ভক্তিমতী সন্ন্যাসিনীর আবির্ভাব হইল। যেন মূর্ত্তিমতী প্রেমভক্তিপরায়ণা —সাধ্বী লক্ষ্মী,—মন্দাকিনী ও ভোগবতীর পুণ্য-সলিলে স্নাতা ও পবিত্রা হইয়া,—এই জ্ঞান-গঙ্গায় অবগাহন করিয়া,—অমৃতের অধিকারিণী হইয়াছেন, আর সেই অমৃত বিলাইবার উদ্দেশ্যে,—করুণামাখা উচ্চ মধুরস্বরে,মায়ার জীবকে ডাকিয়া বলিতেছেন,—

"রাম-নামের তরী বোয়ে যায়;
তোরা কে যাবিরে পারে আয়॥"

মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সভাস্থ সকলে এই অদ্ভুত সন্ন্যাসিনীকে দেখিতে লাগিল, ও তাঁহার অদ্ভুত স্বর-ভঙ্গিমায় স্তম্ভিত হইয়া রহিল। সকলের দেহ রোমাঞ্চিত ও হৃদয় ভক্তিতে ভরিয়া উঠিল। ভক্তগণ 'মা মা' বলিয়া মুহুর্ম্মুহু হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। ঠাকুর দেখিলেন, তাঁহার সেই আদিভক্ত সরমা,—তাঁহার নিষেধ না মানিয়া এখানে পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে। মাতৃভাবে মহাপুরুষের প্রাণ ভরিয়া উঠিল। আবার তাঁহার ভাব-সমাধি আসিল।

"মা আনন্দময়ি! তুমি এখানে?"—বলিতে বলিতে মাতৃমন্ত্র-প্রচারক, মার সিদ্ধ সন্তান ও মহান্ অবতার, দয়াল ঠাকুর রামকৃষ্ণ,—ভাবাবেশে সমাধিস্থ হইলেন।

আবার সেইরূপ নির্ব্বিকল্প সমাধি,—জীবনের চিহ্নমাত্র নাই।

তখন সরমা তাঁহার কানের কাছে গিয়া, সুধাবর্ষী কণ্ঠে, মধুর কীর্ত্তনাঙ্গে, মাতৃ মহামন্ত্র শুনাইতে লাগিলেন,—

"ওমা. দেখ্ না চেয়ে. আমুদে মেয়ে,
ধূলায় লুটায় জগৎ গোঁসাই।
(আহা, সোনার বরণ ধূলায় লুটায়,
দেখ্ না চেয়ে।)
(আমার মাথা খেয়ে চোখ বুজিয়ে আছিস,
দেখ্ না চেয়ে।)
(এমন নিকষা জননী দেখিনি ত আর
দেখ্ না চেয়ে।)
মায়ে পোয়ে ভাব, নাহিত অভাব.
তবে কেন দেখি আমার রামাই ;—
যখন তখন, হোয়ে অচেতন,
পোড়ে থাকে ভূমে. সাড়্ না পাই ॥
একি তোর খেলা, পাষাণী বগলা,
তোর স্নেহ আমি বুঝিতে না চাই ;—
(যে জন) হাসায় কাঁদায়, তায় সুখ পায়.
তার দয়া মায়া—নাই—নাই—নাই ॥
(থাকলে কি আর এমন হয় গো.
নাই—নাই।)
(দয়া মায়া যার আছে—সে কি গো নিদয়া হয়,
নাই—নাই।)
(ভালবেসে কে এমন হয় গো,
নাই—নাই।)

মাতৃনামে ঠাকুরের সংজ্ঞা আসিল, তিনি আবার প্রকৃতিস্থ হইলেন। জ্যোতির্ম্ময় মুখখানি হাসিমাখা ; সেই হাসিমাখা মুখে অস্পষ্ট মাতৃনাম। নাম ক্রমে সুস্পষ্ট হইল ; ভাব ঘনীভূত হইয়া ভক্তির তরঙ্গ ছুটাইল। ঠাকুর দিব্যকণ্ঠে, সেই কীর্ত্তনস্বরেই উত্তর দিলেন,—

"মার চেয়ে যে ভালবাসে
ডাইন্ বলে তায় সকলে।
হোক্ না কেন ব্যথার ব্যথী,—
তাই বোলে কি যাবো ভুলে ॥
(আমি ত তা পার্‌বো না গো)
(তুমি যে হও সে হও আমি পার্‌বো না গো)
(মার চেয়ে ভালবাসা আছে কারো—
আমি বোল্‌তে পার্‌বো না গো)
মা আমার আনন্দময়ী,—
দয়াময়ী, দয়ার বলে ;—
(জীবকে) হাসায় কাঁদায়, জ্বালায় পোড়ায়)
সাঙ্গা করে ফেলে কোলে ॥
(নিজের মনের মত কোর্‌বে বোলে গো)
(মায়ার ফাঁদে পোড়্‌বে না বোলে গো)
(বিষ খেয়ে পাছে না মরে বোলে গো)

মাতৃনামগান সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, উচ্চ গম্ভীর-স্বরে মা মা বলিতে বলিতে, সাক্ষাৎ মায়ের ছেলে, আবার গভীর সমাধিতে মগ্ন হইলেন।

সরমা তখন অভিমানভরে, অতি করুণামাখা-স্বরে, গানেই তাহার প্রত্যুত্তর দিল,—

"রাম নামে আমি স'পেছি জীবন,
মা-নামে তোমার সাধ।
ভাল তাই হোক্, তোমারি হে জয়,
আমি না সাধিব বাদ॥
(বাদ সাধিব না গো।)
(তোমার মা-নামে বাদ সাধিব না গো।)
(তোমার ব্রহ্মময়ী নামে—বাদ সাধিব না গো।)
রাম পিতামাতা, প্রাণের দেবতা,
পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্।
তব রূপে হরি, সে রূপ-মাধুরী,
হেরি সদা বিদ্যমান॥
(তোমার ঐ রূপে হে)
(ঐ অপরূপ রাম-রূপে হে)
(ঐ ভক্ত-রঞ্জন রূপে হে)
শ্রীমুখে শুনেছি, জীবনে দেখিছি,
এক রূপে বহু তুমি।

যেই কালী কৃষ্ণ, সেই রামকৃষ্ণ,
কিছুতে না আছে কমি ॥
(কমি কিছুতে নাই ত হে)
(কল্পতরু কালীকৃষ্ণরামে—কিছু কমি নাই ত হে ,
(রামকৃষ্ণ যদি হে তুমি—শুধু আমার রামই বা হোলে)
(নামে কিবা আসে যায়—বোলে দাও না শুনি)"

ঐ নাম-গানেই ঠাকুরও তাহার উত্তর দিলেন। ভক্তের হাটে যেন ভক্তির সজীব অভিনয় চলিল। এবার মঞ্চোপরি বসিয়া ঠাকুর গাহিতে লাগিলেন,—

"তা যদি বলিলে, তবে 'মা' বল না—কেন মা।
মা—মা—মা নামে কেন ডাক না শ্যামা ॥
(একবার বদন ভোরে উচ্চৈঃস্বরে ডাক না শ্যামা)
(সেই ব্রহ্মময়ী শ্যামা মাকে একবার ডাক না গো মা)
(আমার কল্পতরু কালী-মাকে একবার ডেকে দেখ না)
(ও মুখে শুনাবে ভাল—একবার প্রাণভোরে ডাক না মা)
(মা আনন্দময়ী বোলে—একবার ডেকে নাও না)
(তোমার রাম-নাম কিগো, এতই ভাল,—
(একবার মা বল না)

"মা—মা—মা"—বলিতে বলিতে ঠাকুর এবার অর্দ্ধ সমাধিতে রহিলেন। চক্ষু অর্দ্ধ উন্মীলিত, মুখখানি অপূর্ব্ব হাসিমাখা।

ভক্তিমতী সরমা এবার সজলনয়নে, যেন কতকটা অপরাধীর ভাবে, কৃতাঞ্জলিপুটে নতজানু হইয়া, কীর্ত্তনচ্ছলে ঠাকুরকে জানাইলেন,—

"স্বপনে যে ছবি এঁকে গেছে বুকে
কেমনে মুছিব তায়।
ঐ রাম-রূপ, ঐ রাম-নাম,
পরাণ আমার চায়॥
(ভাবরূপী তুমি--জানতো সবি)
ও পদ-সরোজে, বিকায়েছি আমি,
আমার ত আমি নাই।
তুমি রাখ মারো, যা খুসী তা কর,
শ্রীচরণ শুধু চাই॥
(আর কিছু চাই না হে)
(এই টুকু আমার রেখে দিও হে)
(ঐ চরণ ছাড়া আমায় কোরো না হে)

এবার ঠাকুর ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "হার্ মান্‌লেম সরমা! তোমারই জয়।"

সরমা। আমি কে প্রভু?--সব তুমি। তবে যে তুমি আদর কোরে বোল্‌লে, এ তোমারই মহিমা।—কেননা, তুমি ভক্তের ভগবান! এ জয়

আমার নয়,—তোমার পদাশ্রিতা শুদ্ধা ভক্তির জয়। তোমার এ নর-লীলার জয়। তোমার দৈবী মায়ার জয়।

সকলে। (সমস্বরে) জয় গুরু রামকৃষ্ণ।

জয় পতিতপাবন রামকৃষ্ণ।

জয় কাঙ্গালের ঠাকুর রামকৃষ্ণ।

ভক্তগণ আনন্দোল্লাসপূর্ণ হৃদয়ে, ঠাকুরকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতে করিতে, উচ্চ মধুরকণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন,—

"জয় জয় জয় সবাই বলো বদন ভোরে।
বদন ভোরে বদন ভোরে—রামকৃষ্ণ-নামের ভেলা ধোরে ॥
(এমন নাম আর হবে না রে)
(এমন দয়াল নাম আর হবে নারে)
(এমন মধুর নাম আর হবে নারে)
জয় রামকৃষ্ণ—রামকৃষ্ণ—বলো সবে উচ্চৈঃস্বরে।
বোল্‌তে বোলতে পতিতপাবন আস্‌বে ঘরে।
আস্‌বে ঘরে আসবে ঘরে উদয় হবে হৃদয়-পুরে।
তখন জন্মজন্মের মনের আঁধার একমাত্রে যাবে দূরে।
(রামকৃষ্ণ-প্রেম-চন্দ্রোদয়ে)
(মধুর রামকৃষ্ণ নামে)
(দয়াল রামকৃষ্ণ নামে)

এইবার একজন ভক্ত—সেই গৈরিক আল্‌-খেল্লা উন্মীলনকারী গোস্বামী—ভাবাবেশে ঠাকুরকে দেখাইয়া—আঁখর দিবার ছলে গাহিলেন,—

"এই কৃষ্ণ—এই কৃষ্ণ এই কৃষ্ণ দেখ সবে।"

সরমাও অমনি যেন তাড়িয়া ফুঁড়িয়া সেই ভক্তকে বাধা দিয়া, সঙ্গীতেই বলিয়া উঠিলেন,—"এই রাম।"

ভক্ত। "এই কৃষ্ণ।"

সরমা। এই রাম।

ভক্ত। এই কৃষ্ণ।

সরমা। এই রাম।

ভক্ত। এই কৃষ্ণ।

এবার আর একজন ভক্ত গাহিলেন,—

"রামকৃষ্ণ—রামকৃষ্ণ—রামকৃষ্ণ এই।"

"একাধারে বিরাজ করে এই।"

"জয় রামকৃষ্ণ—রামকৃষ্ণ—রামকৃষ্ণ এই।"

সরমা। এই রাম।

গোস্বামী। এই কৃষ্ণ।

সরমা। এই রাম।

গোস্বামী। এই কৃষ্ণ।

প্রথম ভক্ত অমনি নাচিতে নাচিতে গাহিলেন,—

"রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ এই।

শুধু রাম নয়,—রামকৃষ্ণ এই।

এবার সরমা, সেই সুরেই উত্তর দিল,—

"তবে তাই হোক—এই।

আমার রামরূপ—এই।

একাধারে রামকৃষ্ণ—এই।

আমার অখিল-স্বামী—এই।

আমার পারের কর্ত্তা—এই।

সকলে। "এই—এই—এই, রামকৃষ্ণ এই।"

"আমাদের পতিতপাবন এই।

আমাদের মধুসূদন এই।

আমাদের দীনবন্ধু এই।

আমাদের দীননাথ এই।

আমাদের কাঙ্গাল ঠাকুর এই।

আমাদের রামকৃষ্ণ এই।—এই এই এই।"

যেন গগন-মেদিনী বিদীর্ণ হইয়া এ জয়ধ্বনি উঠিতে লাগিল।

এবার সরমা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন,—"ধন্য ধন্য এ কলি-যুগ! ধন্য ধন্য এ কলির মানুষ!—শত

অপরাধেও তুমি এ পতিতপাবন-নামে পরিত্রাণ পাবে।”

তখন ভক্তগণ ঠাকুরকে বেষ্টন করিয়া, যেন কি এক দৈবী শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া, “নমো রামকৃষ্ণায়ঃ” বলিয়া, তাঁহার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহাদের মানস-পূজা সাঙ্গ হইল। গুরুকে তাঁহাদের সাক্ষাৎ জগদ্‌গুরু নারায়ণ জ্ঞান; জগদ্‌গুরু ঠাকুরও প্রসন্ন হইয়া, কল্পতরুরূপে, ভক্তগণের সে পূজা বা পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিলেন। যথাবিধি তাঁহার ভোগরাগও দেওয়া হইল।

সহরের বুকের উপর, জনকোলাহলপূর্ণ পল্লীর ভিতর,সহস্র চক্ষুর মাঝে, এই ক্রিয়া সম্পন্ন হইল. ভোগরাগাদি যথাবিধি বিতরিত হইল। সকলে প্রসাদ পাইল। কেহ ভক্তিভরে তাহা গ্রহণ করিল, মাথায় রাখিল, গৃহে লইয়া গেল। কেহ বা বিস্ময়ে ‘না যযৌ ন তস্থৌঃ’ হইয়া রহিল। আর কেহ বা কৌতূহলভরে আপন মন অনুযায়ী রঙ্গ-রহস্য করিবার অবসর খুঁজিতে লাগিল। জগাই মাধাই সকল সময়েই আছে ও থাকিবে। সুতরাং ব্যঙ্গ বিদ্রূপ

ও গ্লানির খুঁৎ রহিল না ;—সময়ে সুদসমেৎ তাহা সমধর্ম্মা জীবসমাজে প্রচারিত হইল। মহাপুরুষ পুণ্যশ্লোক প্রেমাবতারের নামে নানাবিধ কুৎসা রটিল,—স্থান বিশেষে এখনো রটিত হয়।

তা রটুক। নহিলে লীলার সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি হইবে না। সত্যের শুভ্রালোকে অন্ধকার বিদূরিত হইবে না। জীব তাঁহার অদ্ভুত আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবে না।—জয় প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণ!

তৃতীয় খণ্ড।

ভক্তি ও ভক্ত-মহিমা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দুই জন নগরবাসী বন্ধুতে মিলিয়া নিম্নলিখিত রূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

প্রথম। আচ্ছা বলো দেখি, আসল ব্যাপারখানা কি ?. সত্যি কিছু আছে,—না ষোল আনাই বুজ্‌রুকি ?

দ্বিতীয়। ঠিক্ খম্ কোর্‌তে পাচ্ছি না। খায় দায় থাকে, আমাদেরই মত চৌদ্দপুয়া মানুষ ;—ঈশ্বর বা অবতার হয় কিরূপে ?—উঁহুঁ।

প্রথম। (একটু ভাবিয়া) সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু এক একবার বিশ্বাসও হয়। নইলে সহরের ঐ সব নামজাদা লোকগুলোও মেতেছে কেন ? ঐ রাম ডাক্তার, বিষ্ণুসেন, দেবেন্ গোঁসাই—ওরা সব ত

একেবারে গোঁড়া হোয়ে পোড়েছে।—আর শোন নি, বিষ্ণুসেন বাড়ী নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে ওঁর পা পূজো অবধি কোরেছে ?

দ্বিতীয়। হাঁ, শুনেছি। তা লুকিয়ে কেন ?

প্রথম। অতবড় লোকটা, একটু আধটু মান-সম্ভ্রমের ভয় করে। শিষ্যেরা পাছে কিছু মনে করে, কিংবা দল ছেড়ে যায়।

দ্বিতীয়। কিন্তু এ যদি সত্যি হয়, ত একটু তাজ্জব বটে। অত ইংরেজী পড়াশুনো, দিগ্‌গজ,—নিরাকার থেকে সাকারে নামতেও যে রাজী নয়,—সে লোকটা একেবারে একটা মানুষের পা-পূজো অবধি কোরে ফেল্‌লে ?

প্রথম। একজন শিষ্য নাকি কোন রকমে জেনে চেপে ধোরেছিল, তা বোলেছে, যদি সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ দেখি, ত পূজো না কোরে কি করি বলো ?

দ্বিতীয়। তা নিজের সমাজে ও কথা বলে না কেন ?

প্রথম। সমাজের বাঁধন নাকি এখন অনেকটা আল্‌গা হোয়েছে। খোল করতাল নিয়ে হরিনাম

সঙ্কীর্ত্তন হয়, প্রার্থনার সময় মা বোলে ডাকা হয়, তাঁর চরণে প্রণামও করা হয়।

দ্বিতীয়। তবে একেবারে খোলাখুলি সব বোলে ফেলুক না কেন বাপু? আমাদেরও মনের ধোঁকা যায়।

প্রথম। তা কি কেউ বলে গো? ও তো এক-জন বড়লোক;—তুমি আমিই কি সহজে কারো কাছে ঘাড় নোয়াই?

দ্বিতীয়। তা বটে। আর শুনেছ, ঐ গোঁসাই কি রটিয়েছে? সাফ্ সকলের সাম্‌নে ব'লে ফেলেছে,—উনি সেই তিনি—স্বয়ং সেই পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। ঢাকায় না কোথায়—হঠাৎ নাকি উনি একদিন ঐ গোঁসাইকে দেখা দিয়েছিলেন,—তার পরেই অন্তর্দ্ধান।

প্রথম। রাম ডাক্তারেরও ঐ রকম হোয়েছিল,—সেও সকলকে ঢাক পিটে বোলেছে।

দ্বিতীয়। ও লোকটা একেবারে পূরো পাঁড়্। যেমন আগে ঠাকুর দেবতা কিছু মান্‌তো না, সর্পট নাস্তিক ছিল, তেম্‌নি এখন সব উল্‌টে গেছে। ডাক্তারী লেক্‌চার দেবার সময়ও, শুনেছি নাকি,

বিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে—ও তোমার ঐ পরমহংস না কি,—ওঁর ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করে। বলে, 'এমন পূর্ণ অবতার আর কখন হয় নি।'

প্রথম। হাঁ, ও লোকটার বিশ্বাস ও ভক্তি—সকলের চেয়ে বেশী বটে। গৃহীলোক যে এত ত্যাগী হোতে পারে, তা কখন ভাবিনে।—আশ্চর্য্য ব্যাপার! তাই বোল্‌চি ভায়া, ও 'হাঁ না' কিছু না বোলে—তফাৎ থেকে দেখাই ভাল। কি জানি, কি সূত্রে ঘাড়ে এসে চাপে। শুনেছি নাকি, কাউকে একেবারে বৈরাগ্যের দিকে নিয়ে যায়,—কোপ্‌নি সার করায়,—আব কাউকে বা অজস্র ধনমান দিয়ে একেবারে রাতারাতি বড়-লোক কোরে তোলে।

দ্বিতীয়। (স্বগত) আহা, আমার ভাগ্যে যদি ঐ শেষটা ফলে! (প্রকাশ্যে) কিন্তু ভাই, কিছু বোঝ্‌বারও যো নেই।—ঐ তারণ বোস্, পয়লা নম্বরের ঐ পাঁড়্ মাতাল, ঐ কিরণ সরকার,—বেশ্যাসক্ত লম্পট,—ওরাই নাকি আবার লোকটার বেশী প্রিয়পাত্র। বলে, 'আহা! একটু মদ খায় খাক্ না—কত খাবে?—খাক্ না?'

প্রথম। ভিরকুট্টী হোলে এতদিন ধরা পোড়্‌তো। সে এমন সমাধি যে, সত্য সত্যই যেন লোকটা মোরে গেল।

দ্বিতীয়। এই জায়গায় আমার কেমন ধোকা লাগে ভাই। হরিনাম কোত্তে কোত্তে কোন কোন বাবাজীর দশা হত দেখেছি। একটু তোয়াজ রকমারি কোত্তে না কোত্তে আবার 'হরি হে' বোলে উঠে বসে। এ কিন্তু নাকি তা নয়,—একেবারে কাঠ, আড়ষ্ট,—ঘাটের মড়া।

প্রথম। অন্নদার মুখে শোননি? সে একদিন ফটো তুল্‌তে গেছিল। শিষ্যেরা যেমন স্থির হোয়ে বোস্‌তে বোল্লে, অমনি একেবারে ভাব-সমাধি। ছেলেদের মত আবদার কোরে নাকি কেঁদে বোলেছিল,—"মা, মা, দেখ তুমি,—শালারা আমায় কলে ফেলে।"

দ্বিতীয়। হাঁ, শুনেছি ঐ শালা কথাটা যেন মুখে লেগেই আছে। এক রকম আদরের বুলি। —তার পর?

প্রথম। তারপর আর কি? অন্নদা না ঐ ব্যাপার দেখে, তার যন্ত্র পাঁতি সব ফেলে, একেবারে

চোঁচা দৌড়। ভাবলে, পতিা সত্যিই বুঝি সাধুটি মোরে গেল।

দ্বিতীয়। শাম ডাক্তারকে আমি একথা জিজ্ঞেস কোরেছিলুম, তিনি বলেন, 'ও ঠিক্ সমাধি নয়,— একটা রোগ। সমাধি কি আর কথায় কথায় হয়, না সমাধি হোলে মানুষ আবার ফিরে আসে?—ও একটা রোগ। ঐ যেমন হিষ্টিরিয়া, এপিলেপ্‌সি, ভিরমি।'—কথাটা ভাই আমার মনে লাগ্‌লো।

প্রথম। কিন্তু ডাক্তার সরকার তা বলে না। বলে, 'যোগবলে মানুষ অমন হয়।' এমন কি, হেষ্টি সাহেবের মত ইংরেজ প্রফেসরও 'ট্রান্স' (trance) বিশ্বাস করেন। Paradise Lost পড়াবার সময় একদিন ছেলেদের,—পরমহংসদেবকে দেখ্‌তে যেতেও বোলেছিলেন। কিন্তু এমনি হোত।

দ্বিতীয়। তা ভাই তোমার হেষ্টি সাহেবই বলুক আর ডাক্তার সরকারই বলুক,—আমি ও সব কিছু বিশ্বাস করি না।

প্রথম। চৈতন্যদেবেরও কিন্তু এমনি হোত।

দ্বিতীয়। তা তুমি লোকটাকে দ্বিতীয় চৈতন্য বোল্‌তে চাও নাকি?

প্রথম। (ঈষৎ হাসিয়া) চেলারা যে তার চেয়েও বেশী বলে। বলে—'কোন অবতারে একাধারে এমনটি আর হয় নেই।'

দ্বিতীয়। ও চেলা চুলিদের কথা রেখে দাও।—ওরা ত লোকটার 'কামিনী-কাঞ্চন' ত্যাগের কথা লেক্‌চার দিয়ে বেড়ায়,—কিন্তু আসল ভেতোরের খবর তুমি কিছু রাখ ?

প্রথম। কি ?

দ্বিতীয়। 'লাল-ছেলেয়' বড় পিয়ার !

প্রথম। দূর্‌,—কি বলে দেখ ? অমন কথা আর বলো না,—ওতে মহাপাপ হয়।

দ্বিতীয়। মাইরি বোল্‌চি,—আমি শিববাবুর মুখে শুনেছি।

প্রথম। তা হোতে পারে। শিববাবুর মুখের উপর এক দিন তিনি খুব একটা কড়া কথা শুনিয়েছিলেন কিনা ?—তাই আড়ালে এসে তাঁর নামে এই সব কুৎসা রটানো। ছি ছি ! ছেলেদের তিনি ভাল বাসেন কেন জানো ?—বলেন, 'ওরা বড় সরল, এখনো সংসারের কুটিলতা শেখেনি,—কামকাঞ্চনের দাগ্‌ এখনো ওদের মনে বসেনি ;—ওদের যদি এ সময় থেকেই

তৈয়ের করা যায়, তা হোলে এর পর সত্যিই ওরা ত্যাগী ও ঈশ্বরবিশ্বাসী হোতে পার্‌বে।—ওদের দ্বারা ভগবানের অনেক কাজ হবে।'—তা কথাও ঠিক্ ভাই; কাঁচা মাটীতেই গড়ন হয়,—মাটী পাক্‌লে আর কি হবে বল ?

দ্বিতীয়। এই যে তুমিও দেখ্‌চি, একজন মস্ত গোঁড়া হোয়ে উঠ্‌লে যে ?—সওয়াল জবাব কোনটায়ও ত বাদ দিলে না দেখ্‌চি। তবে আর কি, একদিন দুর্গা বোলে গিয়ে দলে ভিড়ে পড়ো।

প্রথম। না ভাই, তুমি আর যা বলো তা বলো, কামকাঞ্চনের বদ্‌নাম তাঁর উপর দিও না,—ওতে সত্যই পাপ হয়। একবার মনে ভেবে দেখ দেখি, বাজারের বেশ্যাকে দেখেও যে, 'মা আনন্দময়ী' বোলে মূর্চ্ছিত হোয়ে পড়ে,—টাকা পয়সা হাতে ছোঁয়াতে-না-ছোঁয়াতে যার হাত কুঁক্‌ড়ে কুঁচ্‌কে এঁকে বেঁকে যায়, সে লোক কি তোমার আমার মত সামান্য মানুষ ?

দ্বিতীয়। এ তো গল্প কথা,—চেলারা পশার বাড়াবার জন্যে রটিয়েছে।

প্রথম। ভুল,—মিথ্যে ধারণা। হাজার হাজার

লোক এ দেখেছে। ঈশেন্ মুকুয্যে, চূড়মণির মত লোকও আপন মুখে একথা বোলেচে। বেশী কি, যাঁর কালী বাড়ীতে তিনি আছেন, সেই কেশব বাবুই নিজে এ পরখ কোরেছেন।—তবে তিনি তাঁর অত আব্দার সন্ন। তাই তাঁর অন্দরে ঠাকুরের অবারিত দ্বার; মার মন্দিরে তিনি যা খুসী তাই করেন।

দ্বিতীয়। এই যে, তোমারও ভাব এলো দেখ্‌চি—একেবারে ঠাকুর বোলে ফেল্‌লে।—তা তোমার সেজ কাকাও ওঁকে অবতার বলেন নাকি? তিনি ত একজন জাঁদ্‌রেল ইংরেজীনবীশ।

প্রথম। অবতার না বলুন,—একজন পরম-যোগী ও তপস্বী বোলে স্বীকার করেন। বিদ্যেসাগর-শাস্ত্রী প্রভৃতিরও এই মত্।

দ্বিতীয়। যদি এতই জানো, তবে আর মাঝে মাঝে ঢং করো কেন? একেবারে সটান্ গিয়ে দড়াম্ কোরে পড়ো—ঢুকে যাক্।

প্রথম। তাই ভাব্‌চি। (স্বগত) হায়! দীন-নাথ কি আমায় দয়া কোর্‌বেন? আমার মনের সংশয় ঘুচিয়ে দেবেন?—দয়াময়, পতিতপাবন!

কাঙ্গালের ঠাকুর কৃপা করিলেন। যে একবার মনের সহিত ব্যাকুল অন্তরে তাঁকে ডাকে, সে দেখা পায়। অবিশ্বাসী, সংশয়াচ্ছন্ন দুই বন্ধুতে মিলিয়া কৌতূহলচ্ছলে তাঁর কথা আলোচনা করিতেছিল।—অহেতুক কৃপাসিন্ধু জগদ্‌গুরু তিনি ;—তাই যাই একজনের অন্তর একটু দ্রব হইল,—তাঁহার ভাব বুঝিতে একটু আকুলতা জন্মিল, অমনি অন্তর্য্যামী দয়াময়,—সেই বিশ্বাসীর হৃদয়ে অবিভূ‌র্ত হইলেন, এক মুহূর্ত্তেই তাহার মনের ছবি বদলাইয়া দিলেন, নিমেষের জন্য একবার তাহার সম্মুখে আবিভূ‌র্ত হইয়া, তাঁহাকে দেখা দিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

লহমার অভিনয়, লহমায় শেষ। সহসা সে ব্যক্তি কেমন হইয়া গেল। তাহার মনের ভিতর সব উলট পালট হইয়া গেল। ঠাকুরের কৃপা পাইবার জন্য, সে একেবারে পাগল হইয়া উঠিল।

কাঙ্গালের ঠাকুর কাঙ্গালকে কৃপা করিলেন। কাঙ্গালেরও সুকৃতী, সময়ও ঠিক্ হইয়াছিল, তাই এ যোগাযোগ হইল,—সে একেবারে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া জীবন ধন্য করিতে পারিল। ভক্তের ভগবান্,—ভক্তের মনস্কাম পূর্ণ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

ভক্ত গোস্বামী, ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজা করিয়া, তাঁহার চরণে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া, কৃতার্থ ও ধন্য হইয়াছেন,—এখন তাঁহার সাধ, তাঁহার দলস্থ আত্মীয় অন্তরঙ্গ যে যেখানে আছে, আসিয়া, এ পরশমণির স্পর্শে খাঁটী সোনা হউক। কিন্তু সাধ করিলেই ত আর সকলের সাধ পূরে না? জন্মান্তরীণ সুকৃতী না থাকিলে এবং সময় ও সৌভাগ্যোদয় না হইলে, কার সাধ্য, মানুষ ভক্তিপথে অগ্রসর হয়? তাই সরল, সত্যনিষ্ঠ, অকপট-বিশ্বাসী গোস্বামীর কাতর আকিঞ্চনে তাঁহার একটি ইংরেজী-পড়া সভ্যতালোকপ্রাপ্ত আত্মীয়—আজ ঠাকুরের নিকট মনের সংশয় মিটাইতে আসিয়াছেন। ঠাকুর ও

তাঁহাতে যেরূপ কথাবার্ত্তা হইল, নিম্নে তাহা বিবৃত করিলাম।

ঠাকুর বলিলেন, "তুমি কি শুধু তর্ক করিতে চাও ?"

"আজ্ঞা না, মনের সংশয় ভঞ্জন কোত্তে চাই।— ঈশ্বর কি অবতার হোতে পারেন ?"

"কেন পারেন না, আগে তুমিই তা বলো দেখি ?"

"এই আমাদের মত ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগ শোক আছে, রক্ত মাংস দেহ আছে,—কেমন কোরে সেই মহান্ অনন্ত,—এই পরিমিত চৌদ্দপুয়ার মধ্যে সাকার—সান্ত হোয়ে থাকেন ?—মনুষ্য-বুদ্ধির অগম্য।

"যারা ভক্ত ও ভগবান্ কি, না জানে,—জীব ও ঈশ্বরে সম্বন্ধ কি,—না বুঝে, তারাই এইরূপ মনে করে বটে। বদ্ধ জীবের ধারণা ও জ্ঞান, কূপ-মণ্ডূকের মত। কূপের বাহিরে যে আরো ব্রহ্মাণ্ড আছে, ব্যাং তা বুঝ্‌তে পারে না। সে মনে করে, কূপটুকুই তার ব্রহ্মাণ্ড, আর সে সেই ব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট্।"

"এ তো গেল রূপক উপমা। আসল ঘটনাটি কি, আমায় বুঝুতে পারেন ?"

"দেখ বাপু, অধিকারী ভেদে কথা কইতে হয়। এক-সেরী ঘটিতে দশ-সেরী ঘড়ার দুধ কি কোরে ধোর্বে বল ?—তোমার দীক্ষাদি গুরুকরণ হোয়েছে ?"

"আজ্ঞে না।"

"দেখ, যার যেমন মন, তার তেমন ধন। পুরুষোত্তমে গিয়ে কেউ সাক্ষাৎ ভগবান্ দর্শন কোরে জন্মজ্বালা এড়ায়, আর কেউ বা কেবল পুঁইশাক দেখে। শুকদেব, নারদ এঁরা শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ বোলে জানতেন, কিন্তু সাধারণ লোক তাঁকে নন্দঘোষের বেটার বেশী আর কিছু ভাব্তে পাত্ত না। শ্রীরামচন্দ্রের বেলাও ঐরূপ। মুনি ঋষিরা অবধি তাঁর বনগমন শুনে কাঁদ্তে লাগ্লেন। অধিক কি, তিনি নিজেই সীতাশোকে কেঁদে আকুল। তা কথাই আছে,—'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পোড়ে কাঁদে।' কিন্তু যেখেনে বেশী শক্তির বিকাশ, বুঝে নিতে হবে,—সেই খানেই তিনি। তিনিই সব হোয়েছেন, তবে মানুষে বেশী প্রকাশ।

যেখানে শুদ্ধ সত্ত্ব বালকের স্বভাব, হাসে কাঁদে নাচে গায়, সেই খানে তিনি সাক্ষাৎ বর্ত্তমান্। লীলার জন্যেই তাঁর চৌদ্দপুয়া দেহ ধ'রে আসা।"

"তবে ব্রহ্ম কি শুধুই সাকার ?"

"দুই-ই। বেদে বলেন, তিনি সাকারও বটেন, নিরাকারও বটেন—তাঁর ইতি করা যায় না। ভক্তের চক্ষে কিন্তু তিনি সদাই সাকার। কখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের মত দেহধারণ কোরে আসেন, এও সত্য, আবার নানারূপ ধোরে ভক্তকে দেখা দেন, এও সত্য। আবার তিনি নিরাকার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, এও সত্য। যখন সাকার তখন সগুণ; যখন নিরাকার, তখন নির্গুণ তিনি।"

"বড় শক্ত কথা, কিছু বোঝ্‌বার যো নেই।"

"কি রকম জানো ? সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত সাগর। ঠাণ্ডার গুণে যেমন সাগরের জল বরফ হোয়ে ভাসে, তেমনি ভক্তি-হিম লেগে সচ্চিদানন্দ-সাগরে সাকার-মূর্ত্তি দর্শন হয়। ভক্তের জন্য তিনি সাকার। আবার জ্ঞান-সূর্য্য উঠ্‌লে বরফ গোলে যায়, আগেকার যেমন জল, তেমনি জল। তাই বেদে বোলেচে, তিনি বাক্যমনের অতীত। তবে কোন কোন

—এ কি রকম দয়া বলো দেখি? লম্পটটাকে বলে কিনা—'লুচ্চরূপী নারায়ণ।'—তাই এক একবার মনে হয়, ও সব বুজ্‌রুকি।

প্রথম। চেলারা বলে কি জানো, উনি পতিত-পাবন, তাই পতিতের উপরই ওঁর কৃপা অধিক।

দ্বিতীয়। তা এ বড় ত মন্দ কথা নয়,—সারা-জীবন বজ্জাতি বদ্‌মায়েসী কোরে ওঁর কাছে গেলেই তবে উদ্ধার! আর যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে 'হা ভগবান্' কোরে কেঁদে বেড়ায়, তাদের বেলা কিছু নয়।

প্রথম। নয় কি হয়, আমরা জান্‌বো কি কোরে বলো? ঠিক মনের ভাব ত তিনি কাউকে জানান্ না? বিশেষ শুনেছি, তিনি মানু-ষের মন দেখেন, কাজ দেখেন না। কাজে হঠাৎ কেউ কিছু কোরে ফেল্লে, শুনেছি সে সব নাকি তিনি বড় একটা ধরেন না। মনের পাপই তাঁর কাছে পাপ। তা কথাও তাই বটে,—"God sees the heart, & He judges by the will."

দ্বিতীয়। এই যে, তুমিও দেখ্‌চি, একটু একটু ঝুঁক্‌চো।

প্রথম। না, ঠিক তা নয়। তবে লোকটার যে অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, তা অনেকে অনেক রকমে দেখেছে। তা নইলে আর ঐ সব তুখোড়্ ঘোড়েল গিয়েমাত্র কেঁচো হয়? সত্যই অনেক জগাই মাধাই উদ্ধার হোয়েছে। আর এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা, মনের কথা—কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না কোরেও নাকি ঠিক্ ঠাক্ বোলে দিতে পারে।—চল এক দিন যাওয়া যাক্।

দ্বিতীয়। (স্বগত) না বাপু, হয়ত সত্যি সত্যিই মনের ফাঁক্ ধোরে ফেল্‌বে, আর হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্গ্‌বে। (প্রকাশ্যে) না, যেতে আর হবে না, ভবশঙ্করের মুখে সব শুনেছি।

প্রথম। আমার কিন্তু এক দিন যেতে ইচ্ছে হয়।

দ্বিতীয়। দেখো, যেন চেলা হোয়ে পোড়োনি।

প্রথম। সে দাদা, বরাতের কথা।

দ্বিতীয়। হাঁ, আর ঐ একটা কি,—'মা মা' বোল্‌তে না বোল্‌তে নাকিই একেবারে সমাধি হয়,—জীবনের চিহ্ন অবধি থাকে না?—তা সত্যি কি ও সমাধি, না ভিরকুটা?

ভক্তের পক্ষে তিনি নিত্য সাকার। এমন স্থান আছে, যেখানে বরফ গলে না, —স্ফটিকের আকার ধারণ করে।"

"বড় সুন্দর উপমা, কিন্তু মনের সংশয় গেল না।"

"তা কি একেবারে যায় গো? কতজন্মের সংস্কার! আমি বলি কি, এই কলিতে ভক্তি-পথই প্রশস্ত। নারদীয় ভক্তি;—একেবারে অন্তঃপুর পর্য্যন্ত প্রবেশ অধিকার। জ্ঞানপথ কেবল ঐ সদর পর্য্যন্ত। আর কবার কি বোল্‌তেন জানো?— "সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ। কাকো নিন্দি, কাকো বন্দি, দোনো পাল্লা ভারা।"

"তবে নিরাকারবাদীরা কি সকলেই ভ্রম বুঝ্‌ছেন?"

"তা কেন গো? প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী যিনি, তিনিত নিরাকারই দেখ্‌বেন। কিন্তু একটু বিষয়-বুদ্ধি থাক্‌তে, কামিনী-কাঞ্চনের লেশমাত্র চিন্তা থাক্‌তে, তা হবার যো নেই। তাই ঋষিরা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হোয়ে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে চিন্তা কোর্‌তে পেরেছিলেন। এখনকার এ ব্রহ্মজ্ঞান আমার যেন বাপু, কেমন আলুনি আলুনি ঠেকে।"

"আচ্ছা মহাশয়; জাতিভেদের কি কোন প্রয়োজন আছে ?"

"আছে না ? নিশ্চয়ই আছে। যতক্ষণ অহং জ্ঞান, ততক্ষণ ভেদজ্ঞান থাক্‌তেই হবে। কি রকম জানো, যেমন একটি ছোট চারা গাছ পুতে, প্রথম তাকে বেড়া দিয়ে রাখ্‌তে হয়। নইলে লোকে মাড়ায় কিংবা গরু বাছুরে খেয়ে ফেলে। শেষ গাছটা যখন আপনা আপনি বড় হয়, তখন ঐ বেড়াও খোস্‌তে আরম্ভ করে ; তদ্বির কোরে তা আর খসাতে হয় না। মেজাজ যত উদার উন্নত হবে, যত আপন পর ভেদবুদ্ধি ঘুচ্‌বে, ততই ঐ বেড়া-বেড়া আপনা হোতেই খোসে যাবে। কিন্তু তার আগে বেড়া না রাখা মহা নির্ব্বুদ্ধিতা।—গাছের অস্তিত্বই থাক্‌বে না।"

"আচ্ছা আপনি এই যে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় কোরে সাধনা কোচ্চেন, এও তো একরকম জগা-খিচুড়া ?"

"কেউ কেউ তাই মনে করে বটে, কিন্তু আসল বস্তু আমি ভুলি নে। ভগবানের দিকে যে আত্মার মূল লক্ষ্য, তা ঠিক আছে। মানুষগুলো কেবল আপনার আপনার কোট বজায় রাখ্‌তে গিয়ে মরে

কিনা? কিন্তু একটু তলিয়ে দেখ্‌লে বুঝ্‌বে— কিসের মতভেদ? সত্য যা, তা এক—এক বৈ দুই হয় না। সকল ধর্ম্মেই এক সত্য আছে, কেবল ভিন্ন ভিন্ন পথ। যার যে পথ দিয়ে সুবিধে হয়। একই জল, ভিন্ন ভিন্ন নাম। কেউ বলে,—অপ, কেউ বলে পানি, কেউ বলে ওয়াটার। তেম্‌নি ভগবানেরও ভিন্ন ভিন্ন নাম—কেউ বলে রাম, কেউ বলে রহিম, কেউ বা বলে যীশু। আমি কিন্তু ঐ যীশু রহিম রাম—সব তাতেই আমার আনন্দময়ী মাকে দেখি। সেই একই মহাশক্তির মহাবিকাশ। সেই জন্যেই আগে নিরহঙ্কার হোয়ে, কোন রকম মতবিরোধ না কোরে, শক্তিসঞ্চার কোর্‌তে হয় গো। ও শক্তি এলে সব মানিয়ে যাবে,—কোন ধর্ম্মের সঙ্গে কোন ধর্ম্মের ঝগড়া-ঝাটি থাক্‌বে না। ঝগড়া-ঝাটি থাকাটাও ভাল নয়,—কেউ-ই এগুতে পারে না। প্রকৃত ধার্ম্মিক ও ঈশ্বরবিশ্বাসী যে, সে কি কোন ধর্ম্মের নিন্দা করে, না, কাউকে ছোট বোলে আপনি বড় হয়? যখন সকলেই এক মায়ের সন্তান, তখন এ রেষারেষি ভাব থাকা ভাল নয়।”

"আপনার এখানে ত দেখি—সকলশ্রেণীর লোক আসে,—সকলকে সন্তুষ্ট করেন কি কোরে ?"

"অহং ভাবটীকে একটু খাটো কোত্তে পাল্লেই ওটি হয়। সেদিন ঐ যে বিজয় এসে বোল্লে, মশাই অমুক বলে, তিনি চৈতন্য, আর অমুক নিত্যানন্দ ;—তা হোলে আপনি কি হবেন ? আমি বল্লুম, 'কেন, আমি তাঁদের দাসানুদাস ; ভক্তের পদরেণু।'—বাস্, একেবারে ঠাণ্ডা ; সব ঝাল টাল একেবারে জুড়িয়ে গেল। নইলে ঐ নিয়ে যদি হৈ চৈ কোরে গুরুগিরি করতে যেতুম,—সব গুলিয়ে যেতো—মাও বিরূপা হোতেন।—আহা ! সকাল সন্ধ্যা একটু একটু মাকে ডেকো, তিনিই সব বুঝিয়ে ঠিক কোরে দেবেন—নিজের ভিতরেই সব আছে, কারো কাছে বড় একটা যেতে হয় না।"

"আচ্ছা মশাই, ভারতবর্ষে, এই যে এত ধর্ম্ম, এত সম্প্রদায় আছে, এর কোন্‌টি সত্য ?

"বোলেছি ত বাবু, সত্য সকল ধর্ম্মেই আছে ? তবে হিন্দুধর্ম্মই আদি ও সনাতন। এ একটি সমুদ্রবিশেষ। সকল ধর্ম্ম-নদী বা নদ—এতেই এসে মিশেছে বা মিশ্‌বে। মার ইচ্ছায় এখন অনেক নূতন

ধর্ম্ম হবে ও যাবে, থাক্‌বে না। হিন্দুধর্ম্ম যেন একটি অক্ষয় বট, এর শাখা প্রশাখা অনেক হবে যাবে, কিন্তু মূল গাছটি ঠিক থাকবে।”

“তবে আপনি এ মহান্ সত্য প্রচার করুন না?”

“আমিও মস্ত মন্দ, তা প্রচার কোর্‌বো! তা দেখ, যা সত্য, তা প্রচার কোত্তে হয় না,—আপনা হোতেই তার মহত্ব প্রকাশ হোয়ে পড়ে। বোল্‌তে পারি না, কিন্তু দেখো, যদি মার ইচ্ছা হয়, ত পৃথিবীশুদ্ধ লোক এক দিন এই হিন্দুধর্ম্মে আকৃষ্ট হবে। সেদিনেরও বোধ হয় বেশী বিলম্ব নেই। —গুরু গোবিন্দ প্রাণবল্লভ হে! মা, তুমি দেখো!— তোমার বাপু আর কিছু বল্‌বার আছে?”

“আজ্ঞে, নির্লিপ্ত হোয়ে সংসারে থাকা যায় কি রকমে?”

“দেখ, তুমি ছুঁতোরের মেয়ের চিড়ে-কোটার ব্যাপার দেখেছ? ঢেঁকির গড়ে হাত দিচ্ছে, ব্যাপারীর সঙ্গে দেনাপাওনার হিসেব কোচ্ছে, এক হাতে হয়ত খৈ ভাজ্‌চে, আর সেই সঙ্গে বা কোলের ছেলেটিকে মাইও দিচ্ছে;—দিচ্ছে সব, কোচ্চেও সব বটে, কিন্তু তার মন পোড়ে আছে, সেই ঢেঁকির

গড়ের ভিতর—হাত্তের উপর ঢেঁকির সেই মুষল পোড়ে হাত না ভাঙ্গে। তেমনি সংসারের সব কাজ কোরে যেয়ো—না করাও ভাল নয়—কিন্তু মন রেখো ভগবানের উপর ;—তা হোলে আর কিছুতে আট্‌কাবে না, সব সোজাসুজি হ'য়ে যাবে। পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু দেখেছ কেমন মজা,—পাঁকের ছিটেফোঁটাও তার গায়ে লাগে না। সেইরূপ নির্লিপ্ত হোয়ে থাক্‌তে পাল্লেই,—বাস্, মার দিয়া কেল্লা!'

"হায়! কেমন কোরে তা হয়?"

"একটু অহং ভাবটা কমাতে পাল্লেই, ও হোয়ে যায়। কর্ত্তৃত্বাভিমান খাটো কোল্লেই ওটি হয়,—অভ্যাসের ফলমাত্র। তবে মূল তাঁর কৃপা চাই। সেই কৃপাময়ী মাকে ডেবো,—তিনিই সব ঠিক কোরে দেবেন।"

"মাকে ডাক্‌লেই কি পাওয়া যায়?"

"যায় না?—নিশ্চিয়ই যায়। ধন মান নাম যশ—এই সব লাল চুষিকাটি দিয়ে তিনি ছেলেকে ভুলিয়ে রেখেছেন বৈ ত নয়? কিন্তু ছেলে যখন চুষি-কাটি ফেলে দিয়ে তাঁর জন্যে কাঁদে, তিনি কি

না এসে থাক্‌তে পারেন? তবে সত্যিকার কান্না চাই বটে।—আকুল হোয়ে, একনিষ্ঠ হোয়ে কাঁদ্‌লেই মা আসেন। আস্‌তেই হবে তাঁকে। এই এখেনেই এসেছেন।—এই যে, মা, মা, মা!”

মাতৃভক্ত মহাপুরুষ বার দুইচার মা-নাম করিবামাত্রই ভাবে সমাধিমগ্ন হইলেন। তাঁহার মহান্‌ মুক্ত আত্মা মাতৃপ্রেম-সিন্ধুনীরে চিরনিমগ্ন, আমরা মুহূর্ত্তকাল তীরে দাঁড়াইয়া তাহার কি বুঝিব? হায়! তিনি কৃপা না করিলে তাঁহাকে কে বুঝিবে? দয়াময়! অহেতুক কৃপাসিন্ধু! কাঙ্গালের ঠাকুর! বুঝাইয়া দাও, তুমি কে?—আর তোমার এই নরলীলা কি? বিষয়বিমূঢ় মলিনবুদ্ধি আমরা; মনে করি, সব বুঝিয়াছি, কিন্তু কিছুই বুঝি নাই। কৃপাসিন্ধু! তুমিই নিজগুণে এ মোহাচ্ছন্ন আত্মায় আবির্ভূত হও,—আমায় তোমার চরণ সান্নিধ্যে লইয়া যাও,—তোমার চরণসেবা করিয়া দীন আমি, —কৃতার্থ ও ধন্য হই। আর এসংসারে থাকিয়া, দেঁতোর হাসি হাসিতে সাধ নাই দয়াময়!

সন্ধ্যা হইয়াছে, সন্ধ্যা বন্দনাদির সময় হইয়াছে, ঠাকুর ‘হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল’ বলিয়া,

তিনবার হাতে তালি দিয়া, আপন মনে তাঁহার সেই দেবদুর্লভ কণ্ঠে গাহিলেন,—

"ভবে সেই সে পরমানন্দ,—
যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে ॥
সে যে, না যায় তীর্থ পর্য্যটনে,
কালী ছাড়া কথা না শোনে কানে,
পূজা সন্ধ্যা কিছু না মানে,
যা করেন কালী, সেই তা জানে ॥
যে জন কালীর চরণ কোরেছে স্থূল,
সহজে হোয়েছে বিষয়ে ভুল,
ভবার্ণবে পাবে সেই সে কূল,
বল সে মূল হারাবে কেনে ॥"

সত্য। এমনি অহেতুকী ভক্তি না থাকিলে, এমন মহাপ্রেমে প্রাণ পূর্ণ করিতে না পারিলে, কি সেই আদ্যাশক্তি—মূলাশক্তির কৃপালাভ হয়? ভক্ত ও ভগবানে যে যোগ, তাহা এই প্রেম-ভক্তি ও বিশ্বাসবলে। কিন্তু সর্ব্বমূলে শক্তিসঞ্চয়। তাই দয়াল ঠাকুর সকলকেই বলিতেন,—"আগে মাকে ডাক্, মার কৃপা লাভ কর্,—সেই শক্তিবলে সকলি বুঝিতে পারিবি, সব কাজ করিতে পারিবি।—ধন্য হইবি।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

আজ শনিবার, অমাবস্যা, ঠিক কালীপূজা পড়িয়াছে। সমগ্র বঙ্গদেশ জুড়িয়া আজ শক্তিপূজা ও দেওয়ালী উৎসব। ঠাকুর যে উদ্যানস্থ কালীবাড়ীতে থাকেন, সেখানেও আজ মহামহোৎসব। কালীবাড়ীর মালিক—আজ বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া নানাবিধ সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। নানাশ্রেণীর নানারূপ লোক;—মাতৃপূজার মহামহোৎসবে কেহ বঞ্চিত হইবেনা বলিয়াই এইরূপ আয়োজন।

প্রভাত হইতে-না-হইতে আজ নানাশ্রেণীর ভক্তমণ্ডলী দলে দলে আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিয়া যাইতেছে। কেহ বা তাঁহার নিকট বসিয়া তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত সরসমধুর কথামৃত পান করিতেছে,

আর কেহ বা জিজ্ঞাসু হইয়া, যথাবিহিত উপদেশ পাইয়া মনের সংশয় ভঞ্জন করিয়া যাইতেছে। চারিদিকে হাসি খুসি ও আনন্দ,—আনন্দের হাটে সকলেই বাঞ্ছিত আনন্দলাভ করিতেছে।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় রামচরণ নামে বিশিষ্ট একটি ভক্ত আসিয়া ঠাকুরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার তিনি। তাঁহার যেন কিছু ব্যস্তসমস্ত ভাব। হঠাৎ দেখিলে বোধ হয়, ঠাকুর যেন একমাত্র তাঁহারই কেনা জিনিস,—অথবা ভক্তিবলে ভগবান্ তাঁর হাতের ভিতর,—এমনি একটা কিছু ভক্তির অহমিকা-ভাব—কিংবা আর কিছু—হয়ত তাঁহাতে আসিয়া থাকিবে। অন্তর্যামী দৃষ্টিমাত্রেই তাহা বুঝিলেন। ভক্তকে একটু পরীক্ষা করিতে তাঁহার সাধ যাইল। হাসি হাসি মুখে তিনি কহিলেন, "কিহে রাম, খবর কি? বাড়ীই পূজো, আজ যে এখেনে এলে?"

"আজ্ঞে, আমার প্রসাদ ফুরাইয়াছে, কৃপা করিয়া আপনি প্রসাদ দিন।—আমি আবার এখনই যাইব।"—এই বলিয়া ঠাকুরের সম্মুখে কতকগুলি উত্তম ফলমূল ও মিষ্টান্ন রক্ষা করিলেন।

ঠাকুর যেন তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না,—

আপন মনে, সম্মুখে উপবিষ্ট ভক্তমণ্ডলীকে তাঁহাদের জিজ্ঞাস্যবিষয়ে উপদেশ দিয়া যাইতে লাগিলেন।

তাঁহার উপদেশ দানকালে, সময় যে কোথা দিয়া চলিয়া যাইত, কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারিত না,—সকলে স্থান কাল ভুলিয়া যেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার কথামৃত পান করিত। আজও সেইরূপ হইল। সকলে নিবিষ্টমনে তাঁহাতে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহার সেই বেদবাক্য তুল্য অভ্রান্ত অমৃতময়ী উক্তি ও অকাট্য উপমা-প্রমাণ শুনিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া রহিল।

আগন্তুক ভক্ত রামচরণও কিছুক্ষণ আত্মহারা হইয়া তাহা শুনিলেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাঁহার চিত্তবিক্ষেপ হইতে লাগিল। কেননা, এখনো তিনি অভুক্ত, ঠাকুরের প্রসাদগ্রহণ না করিয়া তিনি জলস্পর্শ অবধি করিতেন না। প্রসাদ তাঁহার সংগ্রহই থাকিত,—ফুরাইবার দুই এক দিন থাকিতে তিনি উহা লইয়া যাইতেন; কিন্তু যে কারণেই হোক, এবার তাঁহার সেই প্রসাদে বিভ্রাট ঘটিল। স্নানান্তে আহার করিবার পূর্ব্বে, প্রসাদ গ্রহণ করিতে যাইয়া

তিনি দেখেন, পাত্র শূন্য,—প্রসাদের কণা-বিন্দুও নাই। তজ্জন্য স্বামী স্ত্রীতে একটু বচসাও হইল।

স্ত্রী বলিলেন, "আমি একটু আগে নিজে দেখিয়াছি, প্রসাদ ইহাতে ছিল, তুমি বকিলে কি হইবে?"

"তবে কি হাওয়াতে উড়িয়া গেল?—ইঁদুর-বাঁদর দে খাওয়াইয়াছ বোধ হয়?"

"বিলক্ষণ! এই শিকের উপর এত উঁচুতে—কড়ি বাহিয়া কি ইঁদুর আসিবে,—না বিড়াল বাঁদর শূন্যে লাফ মারিয়া ঢাকা খুলিয়া, প্রসাদ খাইয়া যাইবে? আর তোমার সুধীর,—তা সে অত উঁচু—হাতেও পায় না। বিশেষ আজ সকাল থেকে বাজী তৈয়েরীতে মেতেছে।"

"তা মরুক গে,—আমি গিয়ে এখন প্রসাদ আনি।"

"এই বাড়া ভাত, অতদূর থেকে গিয়ে প্রসাদ আনতে চোল্‌লে?"

"কি কোর্‌বো, তাঁর যেমন ইচ্ছা, তাইত হবে।"

"তা আজ না হয়—"

"ছি! তুমি অমন কথা বোল্লে? আজ স্মাত বৎসর কাল, কখন একদিন দেখেছ, তাঁর প্রসাদ বিনা আমি জলগ্রহণ কোরেছি?"

"হাঁ, তা বটে। তবে—"

"না, ওর আর 'তবে টবে' কিছু নেই। তিনি অন্ন মাপান হবে, নচেৎ নয়।"

স্ত্রী আর কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না, ভক্ত তৎক্ষণাৎ আপন বাড়ীব গাড়ী জোতাইয়া, তাঁহার ইষ্টদেবতা সকাশে উপনীত হইতে যাত্রা করিলেন।

গাড়ী দ্রুতবেগে সহরের উত্তর মুখে—প্রায় তিনক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া চলিল। ভক্ত বাঞ্ছিত স্থানে পঁহুছিলেন।

কিন্তু ঠাকুর, যে কারণেই হোক্, আজ যেন তাঁর ভক্তের প্রতি বিরূপ ; অথবা তাঁহার উদ্দেশ্য বা পরীক্ষা, তিনি ভিন্ন কে বুঝিবে ?—বহুক্ষণ তিনি সেই এক ভাবেই সমাগত ভক্তবৃন্দকে লইয়া তাঁহার অমূল্য উপদেশ দিয়া যাইতে লাগিলেন।

তখন বেলা প্রায় সাড়ে তিন প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, একরূপ অপরাহ্ণ,—ভক্ত একটু চঞ্চল হইলেন। একবার ভাবিলেন, "তবে হয়ত বা এই ভোজ্যসামগ্রী কোনরূপে অপবিত্র হইয়া থাকিবে, তাই অন্তর্য্যামী ইহা গ্রহণ করিতেছেন না। যাই,

হোক, একবার মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।”

ঠাকুর সেই সমভাবেই বাক্য সুধা বিতরণ করিতেছেন, ভক্ত রামচরণ যেন একটু অধৈর্য্য হইয়া বিনীতভাবে জোড়হস্তে জানাইলেন,—“দেব, দয়া করিয়া যদি এগুলি গ্রহণ করিয়া একটু প্রসাদ দেন—”

“ওহে, যখন তখন কি প্রসাদ অমনি পড়িয়াই আছে?”

“আজ্ঞে, আমি এখনো জলবিন্দু অবধি স্পর্শ করি নাই—”

“কে বাপু তোমায় স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়াছে? আমি তোমাদের কারো খাই, না পরি, যে হুকুম করিলেই অমনি তাহা তামিল করিতে হইবে?—যাও, তোমার খাদ্য তুমি ফিরাইয়া লইয়া যাও, আমি উহা গ্রহণ করিব না।”—ঠাকুর যেন একটু রাগতভাবে, কিছু রুক্ষস্বরে এই কথাগুলি বলিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ তথা হইতে উঠিয়া, যেন নিতান্ত উপেক্ষাভাবে, আপন মনে গঙ্গার ধারে পাদচারণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সমাগত লোকগণও একে একে উঠিয়া গেল।

ভক্ত রামচরণ সব দেখিলেন, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। স্নেহময় দয়াল ঠাকুরের এরূপ ভাব—তিনি জীবনে আর কখন দেখেন নাই। আজ যেন তাঁহার চক্ষে বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল। বিষাক্ত শল্যের ন্যায়, ইষ্টদেবতার কথাগুলি, তাঁহার বুকে বিষম বাজিল। চোখে জল আসিল, বুক বিদীর্ণপ্রায় হইল। মনে মনে বলিলেন, "মা মেদিনি, তুমি দ্বিধা বিভক্ত হও,—আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি।"

ভক্তের হৃদয়ে অভিমান আসিল। গভীর মর্ম্মান্তিক অভিমান আসিল। অভিমানে তিনি ফুলিয়া ফুলিয়া মনে মনে কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু চোখের জল ফেলিলেন না,—কিংবা ঠাকুরের নিকটও পুনঃ প্রসাদলাভের আশা করিয়া আর কিছু বলিলেন না। মনে কি একটা দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া তিনি ঠাকুরের সেই শয়নগৃহের ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। দেখিতে পাইলেন, ঠাকুরের শয়ন-খট্টার এক পাশে একটি পিক্‌দানি রহিয়াছে, এবং সেই পিক্‌দানিতে খানিকটা শ্লেষ্মা ও লালা পড়িয়া আছে। ভক্তিবলে অভিমানী ভক্ত, তাহাই ইষ্ট-

দেবতার শ্রীমুখনিঃসৃত সুধা বোধ করিলেন, এবং তাহাতেই সঙ্গে আনীত ফলমূল মিষ্টান্নাদি—জিলিপি পুরি প্রভৃতি—স্পর্শ করিয়া—প্রসাদ করিয়া লইয়া যাইবেন স্থির করিলেন। কেননা, যে কারণেই হোক্, ঠাকুর তাঁহার প্রতি বাম হইয়াছেন,—প্রসাদদানের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে মর্ম্মান্তিক দুর্ব্বাক্য বলিয়াছেন।

ভক্ত মনে মনে ভগবান্‌কে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—

"বটে, বিনাকারণে আমার প্রতি এ কঠোর নিষ্ঠুরাচরণ!—এ শেলসম ব্যবহার! আমার আপন ভৃত্যও আমায় ধরিয়া মারিলে এরূপ কষ্ট হইত না!—হায়! মনে জ্ঞানে ত একদিনও আমি উঁহাকে অবজ্ঞা বা অনাস্থা করি নাই,—তাহার এই প্রতিদান? ভাল ঠাকুর, তোমার কাজ তুমি করিয়াছ,—এখন আমার কাজ আমি করি!—যদি তোমার পদে আমার অবিচলিতা ভক্তি ও নিষ্ঠা থাকে,—সাক্ষাৎ ভগবান্ জ্ঞানে যদি প্রত্যহ আমি তোমায় পূজা করিয়া থাকি, তবে হে অন্তর্য্যামী ইষ্টদেব! তোমার শ্রীমুখনিঃসৃত এই শ্লেষ্মা-লালা

কফ,—যেন আমার পক্ষে অমৃত হয়।—আর আমি ঠাকুর তোমার নিকট প্রসাদগ্রহণে অভিলাষী নহি—এই আমি অমৃত-প্রসাদ লইলাম!"

এই বলিয়া সেই আদর্শ ভক্ত,—সেই বীরভক্ত, সেই সরল একনিষ্ঠ ভক্ত,—নির্বিকারচিত্তে, অম্লান-বদনে সেই পিক্‌দানিতে,—সেই সঙ্গে-আনীত মিন্টান্নাদি স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলেন, এবং তাহাই মহাপ্রসাদ জ্ঞান করিয়া লইয়া যাইবেন স্থির করিলেন।

কিন্তু, অন্তর্যামী—ভক্তের ভগবান্—এবার আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—ত্বরিতপদে, ঝটিতি সেখানে আসিয়া, ভক্তের হাত হইতে সেই মিন্টান্নাদি গ্রহণ করিয়া হাসিহাসি মুখে তাহা শ্রীমুখে অর্পণ করিলেন। ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদের বিষমিশ্রিত অন্ন যেমন ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে অর্পণ করিয়াছিলেন, যেন ঠিক সেই ভাবে দয়াল ঠাকুর, বীরভক্ত রামচরণের খাদ্যদ্রব্য প্রসাদ করিয়া দিলেন। এবং তাহাই সাহ্লাদে, সোহাগে প্রাণোপম ভক্তের মুখে দিয়া বলিতে লাগিলেন, "খাও বৎস, খাও, সারাদিন তুমি অভুক্ত, আমিও

তোমার জন্য অভুক্ত ছিলাম জানিও ;—অসুস্থতার ভাণ করিয়া আমিও সারাদিন কিছু খাই নাই। আজ এই মহাপ্রসাদ অমৃততুল্য হইয়াছে জানিও। এই অমৃতপানে আজ তুমি অমর হইলে।"

অভিমানী শিষ্য এতক্ষণ ফুলিয়া ফুলিয়া মনে মনে কাঁদিতেছিলেন,—এইবার ভগবানের প্রতি তাঁহার সেই ভক্তিতে প্রেমের জমাট বাঁধিল।—তাঁহার আর বাক্যস্ফুরণ হইল না,—চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল।

ঠাকুর কহিলেন, "রামচরণ, আজ আমি তোমার ভক্তির পরীক্ষা লইলাম। এ ঘোর কলিযুগে এরূপ শুদ্ধাভক্তি নিতান্তই দুর্লভ। তোমায় এই ভক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে দেখিয়া,—আজ আমার ত্রেতার সেই পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসবের কথা মনে পড়ে। গুরুকে ব্রহ্মজ্ঞান—তুমিই করিতে পারিলে! তোমার মুক্তির চাবি, তোমার আপন হস্তে,—এক্ষণে কি চাও, বল।"

ভক্তের চক্ষু আবার অশ্রুপূর্ণ হইল। বাষ্প-গদগদকণ্ঠে ভক্ত বলিলেন, "ঠাকুর! আমি ভিক্ষুক

নই যে, আমায় ঐশ্বর্য্য সম্পদ দিয়া ভুলাইবে। মুক্তিও আমি চাহি না, কেননা তুমি আমার আছ। তবে যখন চাহিতে বলিতেছ,—কি চাহিতে হইবে, তুমিই আমায় বলিয়া দাও।”

ঠাকুর যেন একটু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “রামচরণ, আমায় বড় গোলে ফেলিলে। এমন উত্তর আমি দেবতাদিগের মধ্যেও শুনি নাই। তুমি অলৌকিক ভক্তি ও বিশ্বাসবলে সেই দেবতাদিগকেও ছাড়াইয়া গিয়াছ। তবে আর কেন,—দিব্য-চক্ষু ত লাভ করিয়াছ? এইবার ভবের বন্ধন কাটিয়া দিই? তুমি অনুক্ষণ আমার ভিতরে বাহিরে বিহার করো—কি বলো?”

“যাহা করিতে হয়, ঠাকুর তুমিই করো,—আমার আর কিছু বলিবার বা শুনিবার নাই।—কেননা তুমি আমার আছ,—এই মাত্র সার জানি।”

“ভাল তাহাই হইবে।—এখন বরাবর ত বাটী যাইবে?”

“যেরূপ অনুমতি করেন।”

“হাঁ, বাটী যাও, আজ মার পূজা; মহামায়ার মহাপূজা; পূজার উদ্যোগ আয়োজনাদি করো

গিয়া।—বাড়ীতে ত আবার পাঁচটি লোকের সমাগম হইবে?"

"আজ্ঞা হাঁ, আপনার পদধূলি স্পর্শে পুরী পবিত্র হইবে, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণও শুভাগমন করিবেন।"

"তবে যাও, অপরাহ্ণ হইয়াছে, বাটী পঁহুছিতে তোমার সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবে বোধ হয়,—শীঘ্র গমন কর।"

"যথা আজ্ঞা।"

ভক্ত ভগবানের চরণ-রেণু মাথায় লইয়া হৃষ্ট-চিত্তে প্রস্থান করিলেন।

তিনিও চলিয়া গেলেন, আর ঠাকুরও আপন গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া, একেবারে উলঙ্গ হইয়া, পাঁচ বৎসরের শিশুর মত নৃত্য করিতে লাগিলেন। মুখে আর কোন কথা নাই,—কেবল "লাগ্ ভেল্কী লাগ্, লাগ্ ভেল্কী লাগ্"—এই রব, আর হাতে হাতে তালি ও মধ্যে মধ্যে দিব্য উচ্চ হাস্য। সহসা গভীর ভাবোন্মাদ আসিল,—মা মা রবে মহাপুরুষ সমাধিস্থ হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—— ፧✻፧ ——

দ্রুত অশ্বযানে রামচরণ সন্ধ্যার একটু পরেই আপন বাটীতে আসিয়া পঁহুছিলেন। নূতন মানুষ, নূতন জীবন, নূতন বল,—প্রাণে যেন দৈবী শক্তির সঞ্চার হইয়াছে;—সহসা তিনি যেন কেমন হইয়া গেলেন।

বাটী পঁহুছিয়া দেখিলেন, আর এক নূতন বিপদ উপস্থিত;—দৈবক্রমে তাঁহার প্রতিমা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রতিমার মুণ্ড ধড় চূর্ণ, সাজ-গোছগুলি ইতস্ততঃ ভূমে বিক্ষিপ্ত। ভৃত্যগণকে জিজ্ঞাসায় জানিলেন, অনবধানতা বশতঃ পশ্চাতে লোহার কড়ার সহিত প্রতিমার টাট্ বাঁধা হয়

নাই, তাই সজ্জিত প্রতিমা সহসা সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

এদিকে অন্দর-মহলে তাঁহার গৃহিণী—"হায়, আমার কি সর্ব্বনাশ হোলো গো!" বলিয়া, শিরে করাঘাত করিয়া, রোদন করিতেছেন। প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে ঘেরিয়া, যেন গৃহ-স্বামীরই যত দোষ,—তিনি এ সময় কোথায় রহিলেন,—এ তাঁহার বড়ই অন্যায়,—এই ভাবে যেন তাঁহাকে সান্ত্বনার শীতল জল দিতে লাগিলেন। এমন সময় সম্মুখেই গৃহস্বামী উপস্থিত। সহসা তাঁহাকে সেইখানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া কেহ কেহ একটু থতমত খাইল, কেহ কেহ বা কথাটা উল্‌টাইয়া লইল, আর কেহ কেহ বা বাটীর বহু-দিনের পুরাতন ভৃত্য নিমাইকেই একমাত্র অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া কহিল, "তা ঐ বেটার দোষেই ত এই অনর্থ হোলো। প্রতিমার ঠাটে দড়ি দিয়ে কড়ার সঙ্গে বাঁধ্‌তে হয়,—বেটা জানে না?"

এইরূপ মন্তব্য পাশ করিয়া তাঁহারা একে একে সরিয়া পড়িলেন, কেহ কেহ বা বহির্বাটীতে গিয়া বসিলেন। সেখানে গিয়া আবার একজন তখনই

নিমাইএর দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "তা ও বেচারীরই বা দোষ কি ? প্রতিমা সাজিয়ে ছিল যে, তারও কি একটু হুঁস্ নেই ?—সত্যি কথা বাপু বোল্‌তে হয়।—যাও ত বাপ্ নিমাই, এক ছিলিম মিঠে তামাক এনে খাওয়াও দেখি ?"

ইতিমধ্যে গৃহস্বামী রামচরণ বাহিরে আসিয়া বসিলেন। গম্ভীর রাশভারি লোক তিনি ; মুখে হা-হুতাস বিশেষ কিছু করিলেন না। 'যাহা হইবার হইয়াছে' বলিয়া, তিনিই সকলকে একরূপ সান্ত্বনা দিলেন।

তখন একজন প্রতিবেশী কহিলেন, "তা এখনো ত পূজার পাঁচ ছয় দণ্ড বিলম্ব আছে ; কুমারটুলী হইতে একখানা প্রতিমা আনাইলে হয় না ?—খালি প্রতিমা—এক আধখানা বাড়্‌তি—তাদের অমন থাকিতেও পারে।"

"না, তার আর দরকার নেই,—প্রতিমাপূজা আমি আর বাড়ীতে করাবোই না।"

বলা বাহুল্য, কথাটা কাহারো ভাল লাগিল না। কিন্তু কেহই তখনি কর্ম্মকর্ত্তার মুখের উপর জবাবও

দিতে পারিল না। একে রাশভারি লোক, পাড়ার একটা বড় ডাক্তার; তায় আবার আকস্মিক এই দুর্ঘটনা হোয়ে গেল,—মনটা খুবই খারাপ আছে সন্দেহ নাই—এই ভাবিয়া আর কেহ কিছু বলিল না।

কিন্তু একজন শ্বশুরবাড়ীর 'বড়কুটুম্ব' সম্পর্কের লোক,—হাড়পেকে, কোটরচোখো, টারা মানুষ – আকারো সদৃশ প্রাজ্ঞঃ—রসিকতার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া, ব্যঙ্গচ্ছলে রামচরণ বাবুকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "কি জানেন গো মশাইরা, ওঁর সেই কে পরমহাস না কে আছেন, তাঁর পা পূজো কোরেই উনি কৃতার্থ হবেন,—আর বাড়ীর এই সাতপুরুষ-কেলে কালীপূজোয় যে বিঘ্ন হোলো, তাতে ওঁর ভ্রূক্ষেপও নেই।"

সমধর্ম্মা আর একটি জীব—তিনিও শ্বশুরবাড়ার সুবাদে কেউ হইবেন,—সেই লয়ে লয় দিয়া টিট্‌কিরি দিয়া কহিলেন, "হাঁ, তা হবে বটে। নইলে আর ক দণ্ড পরে পূজো, আর উনি কিনা সেই হাঁসের প্রসাদ আনতে গিয়ে এই সন্ধ্যে বোয়ে বাড়ী এলেন? উনি বাড়ী থাক্‌লে ত আর এ সর্ব্বনাশ হোতোনা?"

গুরু-নিন্দা, ভক্তের পক্ষে মৃত্যুতুল্য কষ্টকর। তার পর যে গুরুকে তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া মানেন ও বিশ্বাস করেন, সেই ইষ্ট দেবতার নিন্দা শুনিয়া, পুরুষসিংহ ভক্তবীর—জীমূতমন্দ্রবৎ গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"থাম্ থাম্, ছোট মুখে বড় কথা ভাল লাগে না। মর্কটে রত্নের মহিমা কবে বুঝিয়া থাকে ?"

ভক্তের চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল, মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল,—তিনি আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

তদবস্থায়ও সেই গুণধর শ্রীমান্ ট্যারা পুরুষটি আবার কহিলেন, "আমি সে মূর্ত্তিকে কখন দেখি নাই,—দেখিলে তাঁর গুরুগিরি বুঝাইয়া দিতাম।"

এবার মহাপুরুষ হুঙ্কার ছাড়িয়া কহিয়া উঠিলেন, —"ভাগ্যে থাকিলে ত দেখিবি ? মূঢ়, অর্ব্বাচীন ! কি পুণ্য করিয়াছিস্ যে, সে পতিতপাবনকে দেখিবি ? যা, যা, যা, যে গাড়ীতে তিনি বসিয়াছেন, সেই গাড়ীর কোচোয়ান সহিসের পায়্-ধূলো একটু নিগে যা !—যা, যা, যা, যে ম্যাথর বা মুদ্দফরাস

তাঁহাকে দেখিয়াছে, সেই মেথর ও মুদ্দফরাসের পার ধূলো একটু কোরে নিগে যা;—তোর মত লোকের লক্ষ লক্ষ জীবন পবিত্র হোয়ে যাবে।"

ভক্ত বিশ্বাসীর এই ভীম ভৈরব প্রাণোন্মাদিনী বাণী শুনিয়া, সকলে চমকিত হইল। তৎকালীন তাঁহার সেই ভীষণ রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া সকলে ভয় পাইল। তাহাদের মনে হইল, যেন সম্মুখে ক্রোধান্ধ গোক্ষুরা অতি ভীষণ গর্জ্জন করিতেছে। বুঝিল, কি অপকর্ম্মই করিয়াছি। সভয়ে পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। তাহাদের কাহারো কাহারো সেই মুহূর্ত্তে মনে হইল, যেন বীরভক্ত রামচরণ অদ্ভুত শক্তিবলে বিদ্যুতের ন্যায় তাহাদের হৃদয়ে রামকৃষ্ণভক্তি প্রবেশ করাইয়া দিলেন—এবং একরূপ আশ্চর্য্য!—কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে একজন কম্পিত কলেবরে তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে লাগিল। ভক্তবৎসল ভগবান্,—ভক্তের মুখ রাখিলেন,—কয়েকদিনের মধ্যে সেই অনুতপ্ত ব্যক্তি তীব্র বৈরাগ্যবশে জন্মের মত সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসী হইলেন।

ঝটিকার পর সমুদ্র যেমন শান্ত ও স্থির হয়, বীরভক্ত রামচরণও সেইরূপ হইলেন। ধীরভাবে সকলকে বুঝাইয়া কহিলেন, "ঈশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্য; অবশ্যই এই আকস্মিক প্রতিমা-ভঙ্গের কোন নিগূঢ় রহস্য আছে।"

একটু পরেই তিনি উঠিয়া সময়োচিত ব্যবস্থা করিতে বাটীর মধ্যে গমন করিলেন; সেই অবসরে হিতৈষী প্রতিবেশী আত্মীয়গণও একে একে সরিয়া পড়িল।

অন্দরে প্রবেশ করিয়া তিনি গৃহিণীকে কহি-লেন, "রাত্রি স-দশটার সময় পূজা; তুমি পূজার দালানে গিয়া যথাবিধি ফলমূল ও মিষ্টান্নাদি সাজাইয়া রাখ। রক্তচন্দন, রক্তজবা এবং ফুলের মালাও কিছু অধিক করিয়া রাখিয়া দাও। আজ আমি অভিনব পন্থায় মাতৃপূজা করিব।"

তারপর গৃহিণীকে চুপি চুপি তিনি কি বলি-লেন। সাধ্বী কহিলেন, "তুমিই আমার ইষ্টদেবতা, তুমিই আমার ঈশ্বর; তোমার মনের মানস যা, আমার মানসও তাই।—কেবল একটা আশঙ্কা, কুলদেবতা যদি কুপিত হন। সর্ব্বনাশের উপর যেন আর সর্ব্বনাশ না বাড়ে।

"যদি তাই হয়, তাহাও জেনো মঙ্গলের জন্য। যদি তুমি যথার্থ সতী হও, আমার সহধর্ম্মিণী হও, ত জীবনে মরণে সাক্ষাৎ পতিতপাবনকে বিশ্বাস করিবে। তাঁহার বিধান কখনই অমঙ্গলের নয় জানিও।"

"কিন্তু——"

"না, বিচলিত হইও না, বিশ্বাস হারাইও না। অমঙ্গলের ভিতর দিয়াও তিনি মাঙ্গল্যের পথে লইয়া যান। মাঙ্গল্য বা মুক্তির চাবি তাঁহার হস্তে। কি চাও?—বন্ধন না মুক্তি?"

"তুমি যা চাহিবে, আমারো তাই।"

"শুভে! তোমার নিকট মনের কথা বলিতে আর সঙ্কোচ কি,—আমি এ দুয়ের অতীত,—আমি ভগবান্‌কে চাই। সাধ্বি! তোমার পুণ্যবলে তাহাই আমি পাইয়াছি। আর চাইব কি? তিনি কল্পতরু হইয়া বসিলেও, আমার আর চাহিবার কিছু নাই।"

"তবে আমারো তাই।"

"ভাবিয়া বলো, রাজ্যেশ্বরী বা সাম্রাজ্ঞী হইলেও তুমি হইতে পারিবে; কিন্তু দেখিও সতি! স্বামীর

মুখ রাখিও, প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর কাজ করিও ;—পার্থিব কোন কামনায় যেন আমায় ভগবান্ হইতে বঞ্চিত হইতে না হয়। অধিক কি, তাহাতে যদি এই একমাত্র পুত্র—ঐ সোনার বংশধরকেও 'হারা-' ইতে হয়, তাহাতেও প্রস্তুত থাকিও।"

"উঃ! কি নিষ্ঠুর জ্বালাময়ী তোমার উক্তি! বুকের ভিতর অবধি কাঁপিয়া উঠিয়াছে।"

"আমারো তাই—কি জানি, কেন আজ মন এমন হইতেছে। তবে সাধ্বি! প্রস্তুত থাকিও!—তোমার শক্তিতে আমায় শক্তিশালী করিও ;—যেন ব্রহ্মাণ্ডের বিনিময়েও ভগবান্ হইতে বিচ্যুত হইতে না হয়।"

দশমবর্ষীয় বালক সুধীর, এ সময় সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। কি জানি কেন, পিতা তাহাকে গভীর অনুরাগভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। মাতাও পুত্রের মুখকমলে ঘন ঘন চুম্বন করিয়া কহিলেন, "বাবা, শোও না গিয়ে, রাত ত হোয়েছে।"

"না মা, আমি পূজো দেখ্‌বো। বাবা,—আমি দিনের বেলা একটু ঘুমিয়ে নিয়েছি, জেগে থাক্‌তে পারবো অখন।"

পিতা স্মিতমুখে ইঙ্গিতে জানাইলেন,—'তাই।'

সুধীর পুলকপুর্ণ হৃদয়ে নাচিতে নাচিতে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল। পতিপত্নী উভয়ে পূজার আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি দশটা বাজিয়াছে। ভক্তগণসঙ্গে ঠাকুর আসিয়াছেন। কিন্তু ভক্তের বাটীতে কেমন যেন নিরানন্দ ভাব। অন্তর্যামী সকলি বুঝিয়াও জিজ্ঞাসায় জানিলেন যে, দৈবক্রমে প্রতিমা ভঙ্গ হইয়াছে, ভক্ত তথাপি মানসপূজায় আসান। সে পূজা তাঁহার ইষ্টদেবতাকে লইয়া; কেন না, সেই ইষ্টদেবতাই ত কতবার তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছেন,—'ভক্ত, ভগবান্ ও ভাগবত এক।' তবে মা-কালী ত তাঁহাতেও অধিষ্ঠিতা। বিশেষ তিনি চিরদিন মা-মা করিয়াই আসিয়াছেন,—মাতৃমূর্ত্তি ধ্যানেই সিদ্ধ হইয়াছেন,—তবে ইষ্টগুরুর সেই সজীব পুণ্যময়ী মূর্ত্তিতে মাতৃ-পূজা না হইবে কেন?

ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের অন্তর বুঝিলেন, বলিলেন, "রামচরণ, এ কার্য্যের শেষ অবধি ঠিক্ থাকিতে পারিবে কি ?—গুরু-পূজার দক্ষিণা কি আয়োজন করিয়াছ ?"

গদগদকণ্ঠে ভক্ত উত্তর করিলেন,—"আমার প্রাণ—প্রাণের প্রাণ সর্ব্বস্ব—আমার ভক্তি।"

"তথাস্তু। কিন্তু তোমার সহধর্ম্মিণীরও কি এই মত্ ?"

ভক্ত ইঙ্গিতে জানাইলেন,—'তাই।'

"অতি উত্তম। তবে প্রস্তুত হও। সময় কি হইয়াছে ?—ঘড়িতে ঐ কটা বাজিল ?"

"আজ্ঞে সাড়ে দশটা।"

"তবে আমি এই আসনে বসি ?"

"যে আজ্ঞা।"

পূজার দালানের মধ্যস্থলে—যেখানে প্রতিমা ছিল, ঠিক সেইস্থানে—ঠাকুরের আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার চারিদিকে যথানিয়মে নৈবেদ্য আদিও সজ্জিত হইয়াছিল। ঠাকুর গিয়া সেই আসনে বসিলেন, এবং সুস্পষ্টস্বরে 'কালী, কালী, কালী' বলিতে বলিতে, সমাধিস্থ হইলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন।

কর্ম্মকর্ত্তা, স্বয়ং রামচরণই আজ পূজক,—অভিনব প্রথায় তাঁর এই মাতৃপূজা। প্রতিমা ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু প্রতিমারও প্রতিমা যিনি, সেই সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ তাঁহার সম্মুখে,—তিনি সেই জাগ্রৎ বিরাট্ দেবতার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবেন। তাঁহার গৃহিণীও একটু দূরে—গবাক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া আছেন। ভক্তগণ সকলেই প্রস্তুত। রামচরণ শুদ্ধাচারে আসনে উপবিষ্ট হইয়া, যথাবিহিত পুষ্পাঞ্জলি লইয়া, "জয় মা" বলিয়া, গভীর অনুরাগ ভক্তি সহকারে, গুরু-পদে অর্পণ করিলেন। ভক্তের ভগবান্—অমনি—সেই সমাধি অবস্থায়ও যেন বরাভয়কর হইয়া—দুই হস্ত উর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন,—মুখে অপূর্ব্ব বিদ্যুদ্-জিহ্বাও প্রকাশ পাইল ;—অন্যান্য ভক্তগণ তাহা দেখিয়া বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া "জয় মা" বলিতে বলিতে তাঁহার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিলেন।

সব হইল, কিন্তু বলি কৈ ? বলি ভিন্ন কি মা তুষ্টা হইতে পারেন ? রামচরণ কি এ বলির কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন ?

কিন্তু ওকি !—সহসা বামাকণ্ঠের—ও কি গভীর

আর্ত্তনাদ!—"ওগো, আমার আবার কি সর্ব্বনাশ হলো গো!—আমার শিবরাত্রির সলিতে নিবে গেল গো!"

উন্মাদিনী মূর্ত্তিতে রামচরণের সহধর্ম্মিণী সহসা সেই স্থানে আসিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। রাম-চরণ স্ত্রীর সমভিব্যাহারিণী পরিচারিকাকে কাঁদিতে দেখিয়া কঠোরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"বল্, বল্, বলি পড়িয়াছে ত? মার পূজার কোনরূপ ত্রুটি থাকিবে না ত?—বল্, বল্, শীঘ্র বল্।"

তখন পরিচারিকা কোনও রকমে সংক্ষেপে জানাইল যে, সর্ব্বনাশ হইয়াছে,—তাহার একমাত্র পুত্র সুধীরকুমার অগ্নিক্রীড়া করিতে গিয়া মারা পড়িয়াছে!

"আঃ! ঠিক্ই হইয়াছে! মার বলি পড়িয়াছে! আমার পুত্রের যোগ্য কাজ করিয়াছে!—মা! কালি! করালবদনি! প্রসন্ন হইয়াছিস ত মা? আমার মানস-পূজা ষোড়শোপচারে পূর্ণ হইয়াছে ত? কোন অঙ্গহানি হয় নাই? তবে আর কেন, ছুটা দে মা!—গুরুদেব, দীননাথ! ভক্তের ভক্তি-পরীক্ষা শেষ হইয়াছে? তোমার গুরুদক্ষিণাও মিলিয়াছে?"

ভক্তের এই ভক্তি-উন্মাদে অন্যান্য ভক্তগণ হায় হায় করিতে লাগিলেন।

এইবার ঠাকুর চক্ষু মেলিলেন। সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়া ধীরভাবে কহিলেন, "রামচরণ, তোমার মৃত সন্তানকে ফিরাইয়া চাও? মা-কালী তাহাও আমায় কৃপা করিয়া দিতে পারেন। উঠ, তোমার গৃহিণীকে একথা জিজ্ঞাসা কর। স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া আমায় উত্তর দাও।"

ঠাকুরকে স্বাভাবিক অবস্থায় দর্শনমাত্র রাম-চরণের সে ভাবোন্মাদ অন্তর্হিত হইল। তিনি বেশ সহজ অবস্থায় অবিচলিত ভাবে কহিলেন, "আমার আর নূতন পরামর্শের প্রয়োজন হইবে না। ভগবান্, আমি তোমার কৃপায় এ রহস্য ভেদ করিয়াছি। গৃহিণীকেও পূর্ব্বাহ্ণে সে সঙ্কেত করিয়া রাখিয়াছি। তোমার কৃপায় আমার দৃষ্টি খুলিয়াছে। এখন অধীনের প্রতি কি অনুমতি হয় হোক্।"

ইত্যবসরে রামচরণের সহধর্ম্মিণী চক্ষু মেলিলেন, উঠিয়া বসিলেন, একেবারে ঠাকুরের চরণপ্রান্তে গিয়া নিপতিতা হইয়া বলিলেন, "বাবা, সাক্ষাৎ ভগবান্ তুমি; তুমি বাটী বসিয়া আমার এই সর্ব্বনাশ দেখিলে?"

ঠাকুর। শুধু দেখা কেন মা, তোমার পুত্রের পারত্রিক মঙ্গলের জন্য আমিই অগ্নিরূপে তাহাকে বিনাশ করিয়াছি। যে পরিচারিকা অজ্ঞতাবশতঃ তাহার প্রজ্বলিত দগ্ধ অঙ্গে জল ঢালিয়া দিয়া তন্মুহূর্ত্তেই তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে, আমিই সেই পরিচারিকার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছিলাম। মা, তোমার স্বামী সত্যিকার জীবন্ত কালী-পূজা করিলেন, তুমি তাহাতে মত্ দিলে,—আর এখন আমার বলি আমি নিজে সংগ্রহ করিয়া লইয়াছি দেখিয়া বিচলিত হও কেন? বলো, তোমার সন্তান ফিরাইয়া দিই,—কিন্তু এ পূজার ফলটিও তোমায় ফিরাইয়া দিতে হইবে।—কি চাও?

স্বামী স্ত্রীতে তখন একবার চোখোচোখি হইল। রামচরণ হৃদয়ের সকল শক্তি সঞ্চালিত করিয়া সাধ্বীর হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। তখন সতীলক্ষ্মীর যেন চমক ভাঙ্গিল। পূর্ব্ব অঙ্গীকার স্মরণ হইল। ভাবিলেন,—

"ধর্ম্ম বড়। ধর্ম্মের নিকট পুত্রও কিছুই নয়। বংশলোপ?—কার বংশ? এই সাক্ষাৎ ভগবানের চেয়েও কি এই লৌকিক বংশ বড়? স্বামী পূর্ব্বেই

ত ইঙ্গিত করিয়া রাখিয়াছেন,—‘কোনরূপ কামনার আকাঙ্ক্ষা থাকিলে, কল্পতরুর নিকট রাজ্যেশ্বরী বা সাম্রাজ্ঞীও হইতে পারো,—কিন্তু চিরজন্মের মত তাঁহাকে হারাইবে।’ হায়! সে ইঙ্গিত কি এই? এখন এই পুত্র বড়, না ভগবান্ বড়?”

প্রকাশ্যে কহিলেন, “ভক্তের ভগবান্ তুমি,—তুমিই আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও,—আমার এই একমাত্র পুত্র বড়, না ভগবান্—তুমি বড়?”

ঠাকুর। আমি কি বলিব সাধ্বি! তোমার স্বামীই এ সমস্যা ভঞ্জন করিয়া দিন।

রামচরণ চুপ করিয়া রহিলেন, একদৃষ্টে স্ত্রীকে দেখিতে লাগিলেন। স্বামী স্ত্রীর সে দৃষ্টি—পলকহীন, বহির্জগতের প্রতি তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপও নাই।

স্বামী ইঙ্গিতে বুঝাইলেন,—‘ইহাই ঠিক।” স্ত্রীও সেইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, ‘তবে তাই হোক।’

এত দুঃখের মাঝেও স্ত্রীর একটু কৌতূহল হইল,—তিনি স্বামীকে বলিলেন, “দেখ, একটা বড় আশ্চর্য্য বোধ কোচ্চি। তোমার এই একমাত্র পুত্র গেল, তোমার বংশলোপ হোলো, তুমি একবার এক বিন্দু চোখের জলও ফেল্‌লে না?”

রামচরণ একটু অপরূপ হাসি হাসিয়া কহিলেন, "দেখ, আমার একটা গল্প মনে পোড়লো। গল্পটি ওঁরই (ঠাকুরকে দেখাইয়া) শ্রীমুখ হোতে শোনা—আজ তোমায় তা বলি। একজন চাষার বেশী বয়সে একটি ছেলে হোয়েছিল। ছেলেটিকে সে খুব যত্ন করে। ছেলেটি ক্রমে বড় হোলো। একদিন চাষা ক্ষেতে কাজ কোর্‌চে, এমন সময় একজন এসে খবর দিলে যে, তোর ছেলেটির ভারি অসুখ, ছেলে যায় যায়। বাড়ীতে এসে বেচারী দেখে, ছেলে মারা গেছে। পবিবার খুব কাঁদ্‌চে, কিন্তু চাষার চক্ষে একবিন্দু জল নেই। তখন পরিবার প্রতিবেশীদের কাছে আরো দুঃখ কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লো,—'দেখ্‌লে তোমরা, বাছা আমার জন্মের মত গেল, তা ওঁর চোখে এক বিন্দু জল নেই।' চাষা এ শুনলে। অনেকক্ষণ পরে পরিবারকে ডেকে বোল্লে, 'কেন কাঁদ্‌চি না জান?—এই শোন। কাল রেতে আমি এক স্বপ্ন দেখেছিলেম যে, আমি রাজা হোয়েছি, আর সাত ছেলের বাপ হোয়েছি। স্বপনেই দেখ্‌লেম, ছেলেগুলি রূপে গুণে সুন্দর। ক্রমে তারা বড় হোলো, বিদ্যা ধর্ম্ম

ধন উপার্জ্জন কোল্লে। এমন সময় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। এখন ভাব্‌টি কি, তোমার ঐ এক ছেলের জন্যে কাঁদবো, কি আমার এই সাত ছেলের জন্যে কাঁদ্‌বো ?" *

রোমাঞ্চিত কলেবরে সকলে এই গল্প শুনিলেন। রামচরণের স্ত্রী, মাত্র একটি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "স্বামিন্‌, তোমার চরণে এই প্রণাম ; অন্তর্য্যামী ভগবান্‌, তোমার চরণেও এই প্রণাম ;— আর আমি চোখের জল ফেল্‌বো না। আমার অপরাধ ক্ষমা করো। বুঝ্‌লেম, আমার ছেলে মরেনি,—সে আর এক দেশে বেড়াতে গেছে।"

ঠিক এই সময় ঠাকুর আর একবার মা মা রবে সমাধিস্থ হইলেন।

রামচরণ কহিলেন "হাঁ, এইরূপ কথা আমার স্ত্রীর মুখেই শুনিতে চাই।—চিরায়ুষ্মতী হও সতি !'

---

* এই শ্রেণীর উক্তি ও উপদেশ, ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতেই নিঃসৃত। এই গ্রন্থের অনেক স্থলে সেই অমৃতময়ী উক্তি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তজ্জন্য পূজনীয় 'শ্রীম—কথিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' গ্রন্থকারের নিকট আমি বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

"তার ও আশীর্ব্বাদ কর কেন প্রভু ? বাঁচিয়া থাকাই ত বিড়ম্বনা ?"

"কে বলে বিড়ম্বনা ? একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখ দেখি মা,—কে তোমার পিছনে দাঁড়াইয়া ?"—স্বয়ং ঠাকুর স্মিতমুখে চাহিয়া এই আশ্বাসবাণী দিলেন।

"হরি হরি, হরিবোল। ভগবান্, একি ! আমার মৃতপুত্র সুধীর এখানে ? লীলাময় ! এত লীলা দেখাইলে ?—কোথায় ছিলি বাপ এতক্ষণ ?"—মাতা বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

"কোথায় থাকিব মা !—ঘুমাইতেছিলাম, এই উঠিয়া আসিতেছি। মা-কালীর পূজো কি হোয়ে গেছে মা ? আমি মা বাজী ছুড়িব।"

"আরে বাপ অভাগীর ধন !"—মাতা পুত্রকে কোলে লইয়া মমতার অমৃতধারায় ভাসিতে ভাসিতে ঘন ঘন—পুত্রের মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন।

একজন পরিচারক ছুটিয়া আসিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে রামচরণকে কহিল, "বাবা, বাবা, অদ্ভুত কাণ্ড ! তাজ্জব বানিয়েছে। হঠাৎ কোত্থেকে এক ন্যাংটা সন্ন্যেসী এসে হাস্‌তে হাসতে আপনার মরা

ছেলের গায় হাত দিলে, আর ছেলে হি হি কোরে হেসে—ছুটে তার সঙ্গে গেল।—আমাদের অপরাধ নেবেন না,—শবকে কোন্ বেতাল সিদ্ধ পিশাচ—ছল কোরে নিয়ে গেছে।—একি মা, সুধীর তোমার কোলে?"

"হাঁ নিমাই, প্রাণভোরে হরিধ্বনি করো,—এই কাঙ্গালের ঠাকুরকে প্রণাম করো;—এঁর পদধূলি গ্রহণ করো,—জন্মজ্বালা আর থাক্‌বে না।"

উচ্চকণ্ঠে হরিবোল হরিবোল বলিয়া নিমাই নাচিতে লাগিল।

রামচরণ বলিলেন, "বলো নিমাই, জয় শ্রীরামকৃষ্ণ।"

"জয় শ্রীরামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ! জয় কাঙ্গালের ঠাকুর রামকৃষ্ণ!"

শিষ্যগণ নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ, নতজানু হইয়া, বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে ঠাকুরকে দেখিতে লাগিলেন। হস্ত আপনা হইতে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া আসিল; চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল। কাহারো মুখে আর কোন কথা নাই,—বাক্‌শক্তি যেন চিরবিলুপ্ত হইয়াছে;—

আপন আপন আত্মীয় যেন সকলে অবস্থিতি করিতেছেন।

সহসা সরমা ও সেই গোস্বামী কোথা হইতে আসিয়া জুটিলেন;—গগনমেদিনী প্রতিধ্বনিত করিয়া রামকৃষ্ণ-নামগান করিতে করিতে—শ্রীজয়দেবের অনুসরণে স্তব ধরিলেন,—

"বিতরসি করুণাং বিগলিতা মেদিনী,
অপরূপ নর্ত্তনং শ্রীহরি কীর্ত্তনং,
কেশব ধৃত শ্রীগৌরাঙ্গরূপ,
জয় জগদীশ হরে।

সর্ব্বধর্ম্ম বিরাজিত তব চরণকমলবরে,
শৃণোতি ভবজন বাচং শ্রীমুখসমুদীরিতং,
কেশব ধৃত শ্রীরামকৃষ্ণরূপ
জয় জগদীশ হরে॥"

ঠাকুর হাসি-হাসিমুখে বলিলেন, "বন্দনা করিতে হয়ত, আমার এই প্রকৃত ভক্তকে বন্দনা করো;—কেননা ভীষণ অগ্নিপরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ ইনি,—ইনিই এই বন্দনার যোগ্য। ইহাঁর ভক্তি বিশ্বাস এই নরলোকে একান্ত দুর্লভ। এই শ্রেণীর মহা-

পুরুষের ভক্তিডোরে ভগবান্ বাঁধা।—তাই তিনি 'ভক্তের ভগবান্।'

ইতি তৃতীয় খণ্ড।

গ্রন্থ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীচরণাশ্রিত,

সেবক

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত